বনফুলের হাসির গল্প

বনফুল

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী-স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅনিলকুমার সরকার
এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা
১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৭১

দ্বিতীয় সংস্করণ

মুদ্রক ঃ
শ্রীসত্যচরণ ঘোষ
মিহির প্রেস
৫এ, সরকার বাই লেন,
কলিকাতা-৭

উপহার

....

....

....

॥ সূচীপত্র ॥

সোনার কাঠি ১
খোকন দি গ্রেট ৬
বাঘ ১৬
ভোম্বলা ২২
ভূত ২৮
জন্মান্তর ... ৩৪
বাহুবল ৪৫
সে দিন ভোরে ৫২
দুই খেয়া ৫৯
স্বপ্ন-কাহিনী ... ৬৪
পরীরা সব পারে ৬৯
লাল বনাত ৭৫
বৈকাল-খাত ৭৭
কলার বিসর্জন ৮০
পুষ্প ৮৪
রূপ-রূপান্তর ৮৯
নবজীবন-স্রোত ৯৩
স্মৃতির খেলা ৯৯
বন ফুল ১০৬
স্বাধীনতা ১১১

সোনার কাঠি

এক

তোমরা খোকনের গল্প অনেক শুনেছ। এবার আর একটা শোনো। এটা ভারী মজার। খোকন একবার বুড়োবুড়ির পাল্লায় পড়েছিল। সাংঘাতিক বুড়োবুড়ি। গঙ্গার ধারে তিনটে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া শ্যাওড়া গাছ ছিল। দূর থেকে মনে হত তিনটে দৈত্য বুঝি উবু হয়ে বসে মাথা ঠেকাঠেকি করে কি পরামর্শ করছে। সেই গাছ তিনটের তলায় নাকি বুড়োবুড়ি এসে বসে। আগে আসে বুড়োটা। তার ইয়া লম্বা দাড়ি। মাথায় জটা। হাতে লাঠি। সামনের দিকে একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে। বুড়ো এসে বুড়ির অপেক্ষা করে। খানিকক্ষণ পরে কাশতে কাশতে আর লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে বুড়ি আসে। মাথায় ঝাঁকড়া চুলের বোঝা। আর পিঠে একটা থলি। সেই থলিতে থাকে ঘাড়-মটকানো সব ছেলেমেয়ে। বুড়িই ঘাড়-মটকাতে ওস্তাদ। সেই শিকার করে নিয়ে আসে। বুড়ো তার অপেক্ষায় বসে থাকে। বুড়ি এলে তারপর খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়। হাড় চিবোনোর শব্দ শুনতে পাওয়া যায়—কড়মড়-কড়মড়।

খোকনের দুই বন্ধু হরিশ আর তারিণী গল্পটা তারিয়ে তারিয়ে বলেছিল খোকনকে।

খোকন বিশ্বাস করেনি। ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেছিল—"বাজে কথা, একদম বাজে কথা। ও সব বুড়োযুড়ো কিচ্ছু নেই।"

হরিশ বললে—"বাজে কথা ? বেশ, একদিন গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসো।"

"আমার কি গরজ পড়েছে রাত দুপুরে গঙ্গার ধারে যাওয়ার। মা-বাবা শুনলে যেতে দেবে না। লুকিয়ে যেতে হবে। কি দরকার ওসব করবার।"

তারিণী মুচকি হেসে বললে—"আসলে তুমি ভীতুর শিরোমণি, মুখেই কেবল লম্বাই-চওড়াই কর।"

"আমি মোটেই ভীতু নই।"

"খুব ভীতু। আমি বাজি রাখতে পারি, তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।"

"নিশ্চয়ই পারব। কি বাজি রাখবে?"

"আমার এই নতুন রিস্টওয়াচ্‌টা দেব, যদি যেতে পার। আর গিয়ে যদি ভয়ে দাঁতকপাটি লাগে, তখন?"

"দাঁতকপাটি লাগলে আমি তোমাকে নগদ দশ টাকা দেব। পূজোর সময় মামা আমাকে দশ টাকা দিয়েছিল, সে টাকা খরচ করিনি।"

খোকন বাজি রাখত না। কিন্তু রিস্টওয়াচ্‌টা দেখে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলে না সে। অনেক দিন থেকে তার একটা রিস্টওয়াচ্‌ কেনার ইচ্ছে, বাবা কিছুতেই কিনে দিচ্ছেন না। বলছেন, "যখন কলেজে ভর্তি হবে তখন দেব।"

বাজি রেখে খোকন খুব আনন্দিত হল মনে মনে। সে জানত সে ভয় পাবে না। বাজি জিতবেই।

"বেশ রাজী। কবে যেতে হবে—"

"কাল অমাবস্যা। কাল এসো। রাত বারোটার পর বাড়ি থেকে বেরিও। আমরাও লুকিয়ে থাকব কাছে পিঠে—"

"বেশ।"

দুই

খোকন জেগেই ছিল। বৈঠকখানার ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল তখন আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে, আস্তে আস্তে খিল খুলে বেরিয়ে পড়ল খোকন রাস্তায়। বেরুবার আগে

কপাটটায় তালা-চাবি লাগিয়ে দিল। সন্ধ্যে থেকেই সে সব ঠিক করে রেখেছিল। সঙ্গে নিল শুধু একটা টর্চ। গঙ্গার ধার তাদের বাড়ি থেকে খুব কাছে নয়। মফঃস্বল জায়গা। রাস্তা একেবারে নির্জন। অনেক দূরে দূরে দু'একটা বাতি জ্বলছে। মাঝে মাঝে দু'একটা কুকুর দেখা যাচ্ছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে তারা। খোকনের যেন গা ছমছম করতে লাগল। অথচ অদ্ভুতও লাগল একটু। ঘুমন্ত শহরের এ রূপ সে আগে দেখেনি কখনও। শহরে সবাই আছে অথচ কেউ জেগে নেই। অনেকদিন আগে একটা গল্প পড়েছিল 'ঘুমন্ত পুরী'। সেইটে আবছা ভাবে মনে পড়ল। তাতেই কি ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা ছিল? সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুম ভেঙেছিল যার? এই সব ভাবতে ভাবতে খোকন পথ চলতে লাগল। কিন্তু একটা কথা তার মনে কাঁটার মতো বিঁধে রইল—তার ভয় করছে। মুখে সে অনেক আস্ফালন করেছে বটে কিন্তু আসলে সে ভীতু। তা না হলে এতো গা ছমছম করছে কেন? কিছু দূর গিয়ে তার বুকটা ধক্ করে উঠল। "ওঁ—ওঁ—ওঁ" কিসের শব্দ ওটা? তার পরেই "ম্যা—ও" করে লাফিয়ে পড়ল একটা বেড়াল পাশের দেওয়ালের ওপর থেকে। দুটো বেড়ালে ঝগড়া করছিল। এতেই তার হৃৎকম্প? সত্যিই মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়ল খোকন। একটু জোরে জোরেই হাঁটতে লাগল। গঙ্গার ঘাটে এসে যখন পৌঁছল তখন সাঁ সাঁ করে হাওয়া উঠেছে একটা। গঙ্গার জল থেকেও কেমন যেন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। শ্যাওড়া গাছগুলোর দিকে চেয়ে দেখল। তাদের মধ্যে কোনও চঞ্চলতা নেই। জমাট অন্ধকারের মতো তারা উবু হয়ে মাথা ঠেকাঠেকি করে বসে আছে তিনটে দৈত্যের মতো। খোকন দূর থেকে টর্চ ফেলে দেখলে একবার। কিছু দেখতে পেলে না। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল গাছ তিনটের দিকে। কাছে গিয়ে টর্চ ফেলতেই আবার ধক করে উঠল বুকের ভিতর। দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড সাদা

দাড়ি, হাতে লাঠি। ঠিক তার পাশেই বুড়িটাও এসে দাঁড়াল। কাঁধে বস্তা, হাতে লাঠি, চোখ-মুখ দেখা যায় না, ঝাঁকড়া চুলে সব ঢাকা। সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে খোকন চেঁচিয়ে উঠল—"কে তোমরা ?

তারা কোনও জবাব দিল না। খিকখিক চাপা হাসি শোনা গেল শুধু একটা। তারপর ধীরে ধীরে এগুতে লাগল খোকনের দিকে। খোকনের দাঁতকপাটি লাগেনি, কিন্তু ইচ্ছে হয়েছিল ছুটে পালাতে। হয়তো সে পালিয়েই যেত, কিন্তু কি যেন কি একটা তাকে পালাতে দিলে না। হয়তো সেটা তার আত্মসম্মান। নির্নিমেষে দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল বুড়োবুড়ি তার দিকে এগিয়ে আসছে। এরপর যা ঘটল তা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। খোকনের কাছেও অপ্রত্যাশিত। সে হঠাৎ মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুড়োর উপর আর দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল তার টুঁটি। বুড়োর দাড়ি খুলে পড়ে গেল আর তার কণ্ঠ থেকে যে আর্তস্বর বেরুল তা হরিশের। বুড়ি-বেশী তারিণী এক ছুটে অন্তর্ধান করল অন্ধকারে।

খোকন বাজি জিতেছিল, কিন্তু রিস্টওয়াচ্‌টা নেয়নি। ওই জুয়াচোরদের জিনিস নেবার প্রবৃত্তি হয়নি তার। আর একটা জিনিসও মনে হয়েছিল তার। মুখে সে যতই আস্ফালন করুক, মনে মনে সে যে খুব ভীতু এর অভ্রান্ত প্রমাণ পেয়েছিল সে সেদিন রাত্রে। সামান্য বেড়ালের ঝগড়া শুনেও ভয়ে আঁতকে উঠেছিল সে। পথ চলতে চলতে ক্রমাগত গা ছমছম করেছে তার। এ সব তো সাহসের লক্ষণ নয়! সুতরাং বাজি জেতবার সত্যিকার যোগ্যতা নেই তার। আর একটা উপমাও মনে হয়েছিল তার। 'ঘুমন্ত পুরী' গল্পে সেই রাজকন্যা যেমন অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিল, তার মনের মধ্যে তার সাহসও তেমনি যেন অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেদিন রাত্রে তার যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তা ভয়ের ঠেলায়। তা সুস্থ জাগরণ নয়।

যে সোনার কাঠি রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়েছিল, সে সোনার কাঠি খোকন তখনও পায়নি।

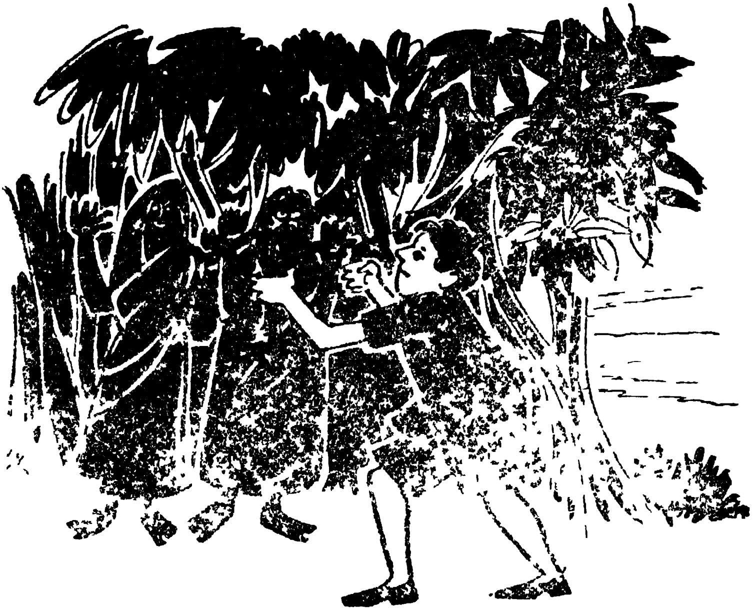

মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বুড়োর উপর।

তিন

এই গল্পটি খোকনের মুখেই শুনেছিলাম আমি। তারপর একদিন শুনলাম খোকন বি. এ. পাস করে ভারতীয় সৈন্যদলে ঢোকবার চেষ্টা করছে।

জিগ্যেস করলাম—"এখন তোমার মনে সাহস জেগেছে?"

খোকন সগর্বে উত্তর দিল—"হ্যাঁ।"

"সোনার কাঠি কোথায় পেলে?"

"আমার পড়ার ঘরে আসুন—"

পড়ার ঘরে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রকাণ্ড একটা ছবি। তার আশেপাশে আরও অনেক শহীদের ছবি —ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকি, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মদনলাল ধেংড়া, সুশীল সেন, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সূর্য সেন, গোপীমোহন সাহা, ভগৎ সিং, যতীন্দ্রমোহন দাস এবং আরো অনেকের।

খোকনের দিকে চাইলাম। দেখলাম তার চোখের দৃষ্টি উদ্ভাসিত।

খোকন দি গ্রেট

এক

দাদু সব শুনে বললেন—"দেশবন্ধু পার্ক তো এখান থেকে অনেক দূর। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে—রামও আসেনি এখনও ! কে যাবে এখন বল অত দূরে—!"

খোকন বললে—"আমি যাব।"

এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন দাদু। চশমাটা কপালে তুলে বললেন—"তুমি যাবে ! এখান থেকে দেশবন্ধু পার্ক ? এই সন্ধ্যে বেলা ? এক কাজ কর। ওই বাঁ-দিকের তাকে যে শিশিটা আছে সেটা পাড়ো তো।"

"কী আছে ওতে ?"

"মধ্যমনারায়ণ তেল। মাথায় একটু চাপড়ে চুপ করে বসে থাক গিয়ে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার—"

"মাথা খারাপ হয়েছে তোমার ! আমাকে এখনও ছোট মনে করছ কী বলে ! এই সেদিন আমার জন্মতিথি হয়ে গেল, চিনু মাসী বললে আমি আট বছর পেরিয়ে ন-বছরে পা দিলুম— আমি ছোট ?"

দাদু তার থুতনিটি নেড়ে বললেন—"না, তুমি মস্ত বড়, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার একেবারে। এখন ওঘরে গিয়ে চুপটি করে শুয়ে থাক যতক্ষণ না তোমার বাবা-মা ফেরে। আমি কে জান—"

খোকন হেসে ফেললে। সে জানে দাদু কী বলবে। তবু সে জিগ্যেস করলে—"কে ?"

"মার্শাল গ্র্যাণ্ডফাদার—জং গোহা, চীফ বডি-গার্ড টু হিজ এক্সেলেন্সি খোকন দি গ্রেট—"

"সোজা করে বল না!"

"আমি খোকনের পাহারা-ওলা। আমি আদেশ করছি তোমার বাবা-মা না ফেরা পর্যন্ত ওঘরে গিয়ে শুয়ে থাক—"

"বাবা-মা সিনেমায় গেছে, দশটার আগে ফিরবে না। এতক্ষণ শুয়ে কী করব?"

"ঘুমোও, কিংবা ছবির বই দেখ। জন্মদিনে খুব ভালো একটা বই পেয়েছ তো?"

"ঘুম পাচ্ছে না। ছবির বই পুরোনো হয়ে গেছে। ও আর কতবার দেখব? না দাদু, আমি দেশবন্ধু পার্কে যাব।"

খোকন পা ঠুকে আবদার জুড়ে দিলে।

দাদুর বয়স সত্তরের কাছাকাছি, তবু এখনও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়েন তিনি। ধর্মগ্রন্থের দিকে তেমন মন নেই। তিনিও বলেন—"ওসব বস্তা-পচা পুরোনো গল্প, কতবার আর পড়া যায়।" একটা খুব ভালো ডিটেক্‌টিভ নভেলই পড়ছিলেন সেদিন সন্ধ্যে থেকে। খুনী এরোপ্লেনে পালাচ্ছে, ডিটেক্‌টিভও এরোপ্লেনে ছুটছে তার পিছু পিছু—এমন সময় খোকন বাধা দিলে এসে।

উঠে বসলেন দাদু।

"আচ্ছা দাদু, তোমার সঙ্গে একটা প্যাক্‌ট করি এস। বন্দীরা সাধারণতঃ পাহারা-ওলাকে ঘুষ দেয় পালাবার জন্য, কিন্তু আমি তোমাকে ঘুষ দিচ্ছি না পালাবার জন্যে,—এই চকচকে আধুলিটি নাও, আর ওঘরে চুপ করে শুয়ে থাক, গোলমাল কোরো না—"

খোকন মুখটি টিপে হাসল। তারপর আধুলিটি মুঠোয় চেপে চলে গেল পাশের ঘরে। দাদু ডিটেক্‌টিভ গল্পে [illegible] গেলেন।

দুই

খোকন চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। দেখল বৃষ্টিটা থেমে গেছে। নিশ্চিন্ত হল। বেশি বৃষ্টি পড়লে হরি বুড়ো হয়তো চলে যেতো। আশা হল এখনও হয়তো আছে। দেখা যাক!

কিন্তু গলির ভিতর ঢুকে হকচকিয়ে পড়তে হল খোকনকে। চিৎকার চেঁচামেচি হল্লা হই-হই—এ কী কাণ্ড! ইট-পাটকেলও চলছে। খোকন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথমটায়, কিন্তু সামলে নিতে দেরি হল না তার। দেখল সামনেই একটা প্রকাণ্ড ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে প্রকাণ্ড দাড়ি-ওলা পাঞ্জাবী সর্দার একজন। খোকন চট করে উঠে গিয়ে নির্ভয়ে বসে পড়ল তার পাশে।

গম্ভীর কণ্ঠে সর্দার জিগেস করলেন, "আপ কৌন হ্যায় বাবু-সাহেব?"

"আপকা দোস্ত্, খোকন—"

"ও! খোকন? হামারা দোস্ত্? কাঁহা সে দোস্ত্ আ গয়ে! পুরা নাম কেয়া হ্যায়—"

"দাদু বোলতা হ্যায় হামারা পুরা নাম—হিজ এক্সেলেন্সি খোকন দি গ্রেট!"

"বহত্ লম্বা চৌড়া নাম। কঁহা যাইয়ে গা?"

"দেশবন্ধু পার্ক। পৌঁছা দিজিয়ে গা?"

"নেহি বাবুসাব। ম্যয় তো হাওড়া যাউঙ্গা।"

"তব্? হাম উতর যায়েগা? রাস্তামে এতনা হল্লা কাহে?"

"এক পাকিট্মার পাকড়া গিয়া—হল্লা আভি কম হো যায়েগা। আপ বৈঠা রহিয়ে, ম্যয় আপকা বড়া রস্তাপর উতার দুংগা—"

একটু পরেই সত্যি হল্লা থেমে গেল। সর্দারজী খোকনকে চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর ফুটপাথে নামিয়ে দিয়ে বললেন,—"বাঁয়ে সিধা যা

কর বিবেকানন্দ স্ট্রীট। বিবেকানন্দ সে সিধা পুরব যা কর রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, উঁহা সে সিধা উত্তর যা কর দেশবন্ধু পার্ক—"

বিরাট গর্জন করে সর্দারজীর ট্রাক রওনা হয়ে গেল হাওড়ার দিকে।

চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর দিকে চেয়ে বুক কেঁপে উঠল খোকনের। মোটর গাড়ির স্রোত বয়ে চলেছে যেন—ঠ্যালা গাড়ি, রিক্শা, ঘোড়ার গাড়ি, রুটির গাড়ি, দুধের গাড়ি, সাবানের গাড়ি, পুলিশের গাড়ি এরাও আছে। লোকে লোকারণ্য। এ রাস্তা সে পেরুবে কী করে! ফুটপাথে ছেঁড়া-ময়লা-কাপড়-পরা একদল যেন বসে ছিল কারা। খোকন তাদের একজনকে জিগ্যেস করলে—"আচ্ছা, রাস্তাটা কী করে পেরুব বল তো?"

ও বাবা, রুক্ষ-ঝাঁকড়া-চুল-ওলা একজন হাউমাউ করে কী যে বললে খোকন বুঝতে পারলে না কিচ্ছু। কে এরা? কোন্ দেশী? বাঙালী নয় নিশ্চয়। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে অজস্র লোক চলেছে। খোকন তাদেরও অনেককে জিগ্যেস করলে। কেউ জবাব পর্যন্ত দিলে না। শেষে তার বয়সী একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হল। ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট পরা, বিড়ি খাচ্ছে! বিড়ি খেতে খেতে বাঁ হাত তুলে নাচছেও। সে-ই খোকনকে বলে দিলে—"ওই যে ওখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে দেখছ? সে একটু পরে হাত তুলবে। দুদিকের 'টেরাফিক' বন্ধ হয়ে যাবে তখন। ঠিক সেই সময়ে জেব্রা লাইন ধরে টুক করে পার হয়ে যাও।"

"জেব্রা লাইন? সে আবার কী?"

"আরে, কোথাকার মুখ্যু তুমি! ওই সাদা সাদা লাইন দেখতে পাচ্ছ না রাস্তার উপর!"

"ওইগুলো!"

"হ্যাঁ, ওইগুলো!"

খোকন জেব্রা লাইন ধরে পার হয়ে গেল রাস্তা। কিছুদূর হেঁটেই আর একটা বড় রাস্তায় এসে পড়ল সে।

"এইটেই কি বিবেকানন্দ স্ট্রীট?"—জিগ্যেস করলে একজন দোকানীকে। মনিহারির দোকান তার।

"হ্যাঁ, এইটেই বিবেকানন্দ স্ট্রীট।"

দোকানে একটা ঘাড়-ছাঁটা লিকলিকে ছোকরা বসে ছিল। সে হঠাৎ বলে উঠল—"কোন গগন থেকে নেবে এলে তুমি চাঁদ! বিবেকানন্দ স্ট্রীট চেন না?"

কোনও জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল খোকন। কিন্তু মনে মনে লজ্জা হচ্ছিল তার। সত্যি, কিছুই তো জানে না সে। কিন্তু একটু আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। সামনেই একটা সন্দেশের দোকান, থরে থরে সন্দেশ সাজানো রয়েছে। খুব লোভ হতে লাগল তার। সন্দেশই কিনে ফেলবে নাকি? সন্দেশ খেতে এত ভালো লাগে তার! অথচ বাবা কিছুতেই কিনবে না। কিনে ফেলবে সন্দেশ? কিন্তু তখনই সে ঠিক করে ফেললে, না কিনবে না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছে তাই আগে সফল করতে হবে তাকে। সর্দারজী বলেছিল বিবেকানন্দ স্ট্রীটে গিয়ে পুব দিকে যেতে। কিন্তু কোন্‌টা পুব দিক? কাউকে জিগ্যেস করবে? লজ্জা করতে লাগল খোকনের। একজনকে শুধু জিগ্যেস করলে—"রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট কোন্ দিকে—"

লোকটা রিক্‌শাওয়ালা। রিক্‌শার উপরেই বসে ছিল।

"সিধা ডাইনে চলা যাইয়ে।—পৌঁছা দেংগে?"

"না।"

হাঁটতে লাগল। কত বাড়ি, কত গাড়ি, কত আলো, কত লোক। প্রত্যেক বাড়িতেই রেডিও বাজছে। মাথার উপর দিয়ে গর্জন করে অ্যারোপ্লেন উড়ে গেল একটা। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে লাগল

খোকন। তার চমক ভাঙল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে এসে। ও বাবা, এও যে এক বিরাট ব্যাপার! মোটর, বাস, মানুষের ভিড় তো আছেই, ট্রামও আছে। এখানে জেব্রা লাইন আছে কি? কই, চোখে তো পড়ছে না। আবার জিগ্যেস করবে কাউকে? না, নিজেই যা পারে করবে এবার।

হঠাৎ খোকনের চোখে পড়ল একটা মোটরে চড়ে তার মামা যেন যাচ্ছে।

"মামা—মামা—মামা—"

মোটরটাকে লক্ষ্য করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে, তারপরেই 'ক্যাচ' করে ব্রেকের শব্দ।

"খুব বেঁচে গেছে—"

"মারো ব্যাটা ড্রাইভারকে। দেখে চলতে পারো না? পুড়িয়ে দাও গাড়ি—" মারমুখী জনতা ঘিরে দাঁড়াল মোটরটাকে, মাঝখানে খোকন। যদিও সে চাপা পড়ে নি কিন্তু কপালটা কেটে গেছে তার। রক্ত পড়ছে।

খোকন বললে—"ড্রাইভার আমার মামা। ওর কোন দোষ নেই। আমি ওঁকে দেখে লাফিয়ে নেবে পড়েছিলাম রাস্তায়—"

"তাই নাকি!"

"কী বোকা ছেলে তুমি?"

"বোকা নয়, বাঁদর।"

"কী কাণ্ড হত এক্ষুণি!

নানা লোক নানা কথা বলতে লাগল।

পুলিশ এসে ভিড় সরিয়ে দিলে শেষে। মোটরের ড্রাইভার গাড়ির কপাট খুলে দিয়ে বললে—"তুমি ভিতরে এসে বস।"

খোকন কাছে এসেই বুঝতে পেরেছিল ড্রাইভার তার মামা নয়, মামার মতো দেখতে।

"আমাকে হঠাৎ তুমি মামা বললে যে—"

"আপনি আমার মামার মত দেখতে। আমার মামারও ঠিক এই রঙের মোটর আছে একটা, তাই আমি ভেবেছিলুম মামা বুঝি—"

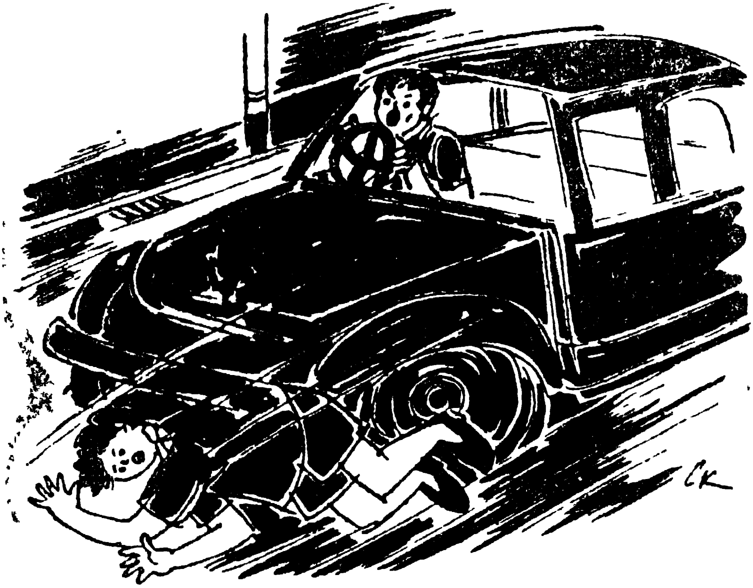

তারপরেই 'ক্যাঁচ' করে ব্রেকের শব্দ

"কোথায় যাবে তুমি- -"

"এখন যাব দেশবন্ধু পার্কে। সেখানে আমার একটু দরকার আছে। তারপর বাড়ি ফিরব—"

"চল।"

"আপনি পৌঁছে দেবেন আমাকে?"

"দেব। তুমি আমাকে মামা বলে আমার গাড়িটাকে বাঁচিয়েছ। এখন চল আগে একটা ডিস্‌পেন্‌সারিতে, তোমার কপালে একটু ওষুধ লাগিয়ে দিই।"

তিন

দেশবন্ধু পার্কে গিয়ে খোকন দেখে হরি বুড়ো নেই। এক জায়গায় কীর্তন হচ্ছে। সেখানে প্রচুর ভিড়।

চানাচুর-ওলা ছেদি বললে—"হরি কীর্তন শুনছে। তুমি চলে যাও না খোকাবাবু, গেলেই দেখতে পাবে ওকে।"

খোকনদের বাসা যখন এ-পাড়ায় ছিল—তখন সবাইকে চিনত সে। খোকন ঢুকে পড়ল ভিড়ের মধ্যে। কীর্তন খুব জমে উঠেছে। কিন্তু হরি কই? খোকনের চেনা একটি লোক বসে ছিল, তাকে জিগ্যেস করলে—"হরি কই?"

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সে। খোকন দেখতে পেলে হরি চোখ বুজে তন্ময় হয়ে কীর্তন শুনছে। দুলছেও একটু একটু।

ও কি, এ সময়ে এখন—? সন্দেহ হল খোকনের। তবু চেষ্টা করে দেখা যাক। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সে। হরি বুড়োর কাছাকাছি গিয়ে সে কানে কানে বললে—"হরি, চোখ খোল, দেখ কে এসেছে!"

আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

"আরে খোকন নাকি—আবার এ পাড়ায় এসেছ নাকি?"

"না—আমি এসেছি—"

তারপর ফিসফিস করে জানালে সে কেন এসেছে।

অবাক্ হয়ে গেল হরি বুড়ো। খোকনের মতো ছোট ছেলে সিংহিবাগান থেকে এতদূর এসেছে তার কাছে—? কিন্তু তার চিন্তাধারাটা হঠাৎ অন্য লাইনে চলে যাওয়াতে রোমাঞ্চিত হয়ে খোকনের মুখের দিকে চেয়ে রইল সে। চোখ বুজে এতক্ষণ সে বাল-গোপালের কথা ভাবছিল—সেই কি? একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে খোকনের মুখের দিকে। খোকনেরও শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ, কোঁকড়ানো চুল, মুখে-চোখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি! হরি বুড়ো খোকনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"ওকি হরি বুড়ো, তুমি কাঁদছ কেন ?"

হরি বুড়োর চোখ দিয়ে সত্যিই জল পড়ছিল টপ টপ করে। কয়েক মুহূর্ত পরে হরি বুড়ো বললে—"আমি যাব। কিন্তু একটু দেরি হবে। সব ঠিক করে নিয়ে যেতে হবে তো ?"

খোকনের নতুন মামা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন রাস্তায়। খোকন তাঁকে গিয়ে বললে—"আমার যেতে কিন্তু একটু দেরি হবে। হরি বুড়োও আমার সঙ্গে যাবে তার জিনিসপত্র নিয়ে। আপনার অসুবিধা হবে হয়তো। আপনি বরং চলে যান—"

"আমার কিছু অসুবিধা হবে না। আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্যে।"

চার

খোকন বাড়ি ফিরে শুনল তার বাবা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। মা কাঁদছেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে। দাদু চরম অপ্রস্তুত হয়ে বসে আছেন, কারণ তাঁর কাছেই খোকন ছিল।

খোকনের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন দাদু !

"কোথা ছিলে এতক্ষণ ?"

"দেশবন্ধু পার্কে গিয়েছিলাম। হরি বুড়োকে নিয়ে এসেছি। সে গরম গরম ফুচকা ভেজে দেবে এইখানে। আর নতুন মামাও এসেছেন—"

খোকনের মা উঠে এসে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

"মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন—"

"ও কিছু নয়। হরি, ভাজতে শুরু কর—"

বাঘা

বাঘা তেঁতুল নয়, কুকুর। নিতান্তই দেশী কুকুর। নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার কর্ণ, রোম বা পুচ্ছে বৈদেশিক কোনপ্রকার ভব্যতা বা বৈচিত্র্য নাই। সাধারণ দেশী কুকুর—তবে চেহারাটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট। পর্যাপ্ত আহারপুষ্ট। বাঘাকে সহসা দেখিলে অপরিচিত কোন ব্যক্তির মনে ত্রাস সঞ্চার হয়তো হইতে পারে, কিন্তু যে বাঘার একবার পরিচয় পাইয়াছে সে বাঘাকে দেখিয়া বিচলিত হইবে না। কারণ বাঘার মত এমন একটি ভীতু কুকুর সচরাচর দেখা যায় না। পটকা ছুঁড়িলে বাঘা হুড়মুড় করিয়া তক্তাপোষের তলায় ঢুকিয়া পড়ে, মাথা চুলকাইলে ছুটিয়া পালায়, ভাবে ঢিল ছুঁড়িল বুঝি!

কারণে অকারণে তাহার আঙ্গুলটি সর্বদাই প্রায় পিছনের পদদ্বয়ের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। আপাতদৃষ্টিতে ইহাই বাঘার পরিচয়। বেচারা বাঘা নিজের নাম সার্থক করিতে পারে নাই।

কিন্তু শিরোমণির মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও জ্ঞান থাকিলে অন্য পরিচয় পাওয়াও সম্ভব। শিরোমণি মহাশয়ের মারফত তারিণীচরণ সে পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তদনুসারে চলিতে ছিলেন। তারিণীচরণই বাঘার মনিব। মনিব না বলিয়া ভৃত্য বলাই অবশ্য সঙ্গত। কারণ ভৃত্যের মতই তিনি বাঘার সেবাপরায়ণ ছিলেন। আমি ছুটিতে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছিলাম। শিরোমণি প্রমুখাৎ আমিও বাঘার সত্য পরিচয়টি জানিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

দুই

ঘটনাটি এই।

বাঘা যখন শিশু, তখন তাহার গোল-গাল নাদুস-নুদুস চেহারাটি দেখিয়াই সম্ভবত তারিণীচরণ তাহাকে পুষিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন।

অধিকাংশ দেশী জিনিসের মত শৈশবে বাঘারও বেশ একটা জৌলুস ছিল। তারিণীচরণ মুগ্ধ হইলেন এবং বাঘাকে আনিয়া গৃহে স্থান দিলেন। কুকুরছানা পুষিলেই তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিবার বাসনা সকলেরই মনে বোধ হয় জাগরূক হয়। তারিণীচরণেরও হইয়াছিল। একটি পাতলা শিকল সহযোগে তারিণীচরণ বাঘাকে উঠানে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বাঘা তারস্বরে চিৎকার করিতেছিল। এমন সময় শিরোমণি আসিয়া দেখা দিলেন। যথাবিধি খানিকক্ষণ বসিলেন, তামাক খাইলেন এবং রোরুদ্যমান কুকুরশাবকের প্রতি দুই-একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে চলিয়া গেলেন। সেদিন আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাহার পরদিন ভোরে আসিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে তারিণীচরণকে বিহ্বল হইয়া পড়িতে হইল। প্রথমে আসিয়াই শিরোমণি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কুকুবশাবকটিকে বেশ খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর তারিণীচরণকে প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, সরোজের মৃত্যু এক বছর হ'ল না?" তারিণীচরণের অগ্রজ সরোজকুমার এক বৎসর পূর্বেই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য কথা।

সুতরাং তারিণী বলিলেন—"হ্যাঁ, তা হবে বইকি। কেন বলুন তো?"

"সরোজের কুষ্ঠি আছে? সেখানা দিতে পার একবার আমাকে?"

"কেন বলুন তো?"

"কুষ্ঠিটা দেখি আগে, তারপর বলছি।"

তারিণীচরণ ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং খানিকক্ষণ খুঁজিয়া মৃত সরোজের কুষ্ঠিখানি আবিষ্কার করিয়া শিরোমণি মহাশয়কে সেটি আনিয়া দিলেন। শিরোমণি সেটি প্রসারিত করিয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। উৎসুক তারিণীর

চক্ষু দুইটি প্রশ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে শিরোমণি বলিলেন—"কুকুরবাচ্চাটিকে খুলে দাও।"

"কেন বলুন তো ?"

"ও সরোজও কুকুরযোনি-প্রাপ্ত হয়েছে। ভাগ্য ভাল যে, তোমার আশ্রয়ে এসে পড়েছে। যত্ন-আত্তি ক'রো ওকে। আর একটা স্বস্ত্যয়ন করানোও দরকার। পরজন্মটায় যাতে সদ্গতি হয়। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ !"

শিরোমণি উঠিয়া পড়িলেন।

বিহ্বল তারিণী তাড়াঅড়ি গিয়া বাঘাকে ছাড়িয়া দিলেন। বাঘার বন্দিত্ব ঘুচিল।

বাঘা যদি মানুষ হইত তাহা হইলে অবিশ্বাসী লোকে সন্দেহ করিত যে, বাঘা বোধ হয় শিরোমণিকে ঘুষ দিয়াছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শিরোমণির আনুকূল্যে ও সহযোগিতায় যথাকালে স্বস্ত্যয়নও হইয়া গেল। সেই হইতেই বাঘা বন্ধনমুক্ত।

বস্তুত সেই বাঘার সুখের দশা পড়িল। তারিণীচরণ কুকুরযোনি-প্রাপ্ত অগ্রজের যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলেন। সরোজ অকৃতদার ছিলেন। সুতরাং সরোজের বিধবার আদর-যত্ন লাভে বাঘাকে যদিও বঞ্চিত হইতে হইল, কিন্তু তারিণীচরণ ভ্রাতৃভক্তির যেরূপ নমুনা দেখাইতে লাগিলেন তাহাই বাঘার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার উপর বিধবা থাকিলেও বাঘার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর হইত কিনা সন্দেহ।

সুতরাং বাঘা সুখে ছিল।

তারিণীচরণ এবং শিরোমণিও সুখে ছিলেন।

পরস্পর দেখা হইলে নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন প্রায়ই হইত।

"সরোজ ভাল আছে তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কর্ত্তব্য ক'রে যাও—ফলাফল ভগবানের হাতে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—যথাসাধ্য ক'রেই যাচ্ছি।"

করিতেও ছিল।

এইভাবেই চলিতেছিল এবং শেষপর্য্যন্ত বোধহয় চলিতও। কিন্তু

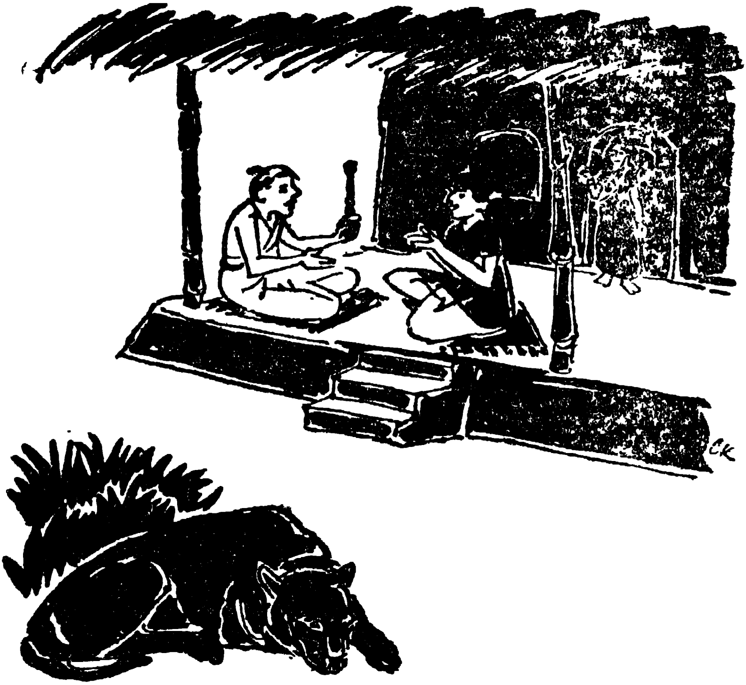

সরোজও কুকুরযোনি-প্রাপ্ত হইয়াছে।

হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। রিট্রেঞ্চমেণ্টের ধাক্কায় বেচারী তারিণীচরণের চাকরিটি টিকিল না।

যদিও অন্নবস্ত্রের জন্য তারিণীচরণকে কোনদিন চাকরির উপর নির্ভর করিতে হয় না, তবু বেচারার একটু কষ্ট হইল বই কি। যদিও

তিনি এখনও বিবাহ করেন নাই, জমিজমা কিছু আছে, আজকালকার বাজারে মাসিক চল্লিশ টাকা আয় নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মত নহে। তারিণীচরণ একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। কালক্রমে তাঁহার এই বিমর্ষভাবটা হয়তো কাটিয়া যাইত, কিন্তু বাঘা কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে অন্নজল ত্যাগ করাতে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। তারিণীচরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

শিরোমণি শুনিয়া বলিলেন—"ও অন্নজল ত্যাগ করবে না? হাজার হোক দাদা তো! তা ছাড়া তুমি যে ওর প্রাণ ছিলে ভায়া! তোমার চাকরি গেছে শুনে ও অন্নজল ত্যাগ করবে না তো কে করবে?"

শিরোমণির চোখে জল আসিয়া পড়িল।

তারিণীচরণ আগে হইতেই কাঁদিতেছিল।

শিরোমণি চক্ষু-মার্জনা করিয়া বলিলেন—"যাই হোক, খাওয়াবার চেষ্টা কর তুমি। তুমি অনুরোধ করলে ঠিক খাবে।"

শুনিলাম, বাঘা একটা অন্ধকার ঘরের কোণ আশ্রয় করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত কি হইল তাহা দেখিবার সুযোগ তখন আর ঘটিল না। আপিস খুলিতেই শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হইল।

তিন

কয়েকদিন পরে হঠাৎ এক জরুরি তার পাইলাম—"অবিলম্বে চলিয়া এস।"

তার করিতেছেন আমার গৃহিণী অর্থাৎ শিরোমণির ভগিনী।

যাইতে হইল। গিয়া শুনিলাম, বাঘা তারিণীকে কামড়াইয়াছে।

সে কি! আরও শুনিলাম, বাঘা তারিণীকে কামড়াইয়া মারা গিয়াছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ডাক্তার ডাকিলাম।

ডাক্তারটি স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন লোক।

সুতরাং বলিলেন—"দুইজনেরই হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক হইয়াছে। বাঁচিবার আশা নাই।"

এখন সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে হরিসংকীর্তন হইতেছে।

ভোম্বলদা

মোটাসোটা গোলগাল চেহারা।

দেখা হইলেই মুখখানি স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়া ওঠে। হাতে এক টিপ নস্য লইয়া এবং নাকের আশেপাশে নস্য লাগাইয়া ভোম্বলদা সকাল হইতেই রাস্তার মোড়টিতে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং পরিচিত পথিকমাত্রকেই সাহাস্যমুখে সম্ভাষণ করেন।

ইহা তাঁহার দৈনন্দিন কার্য।

"মাতুল যে, মাছ কত ক'রে কিনলে? গ্র্যাণ্ড মাছ তো! ছ' আনা সের? বল কি!"

"বাজার-দর অবশ্য আট আনা, আমি পেয়েছি ছ' আনাতে।"

ভোম্বলদা সবিস্ময়ে বলিলেন—"ড্যাম চীপ্!"

সস্তায় জিনিসপত্র কিনিতে পারেন বলিয়া মাতুলের অহঙ্কার আছে। কেহ সে কথার উল্লেখ করিলে তিনি খুশি হন। মাতুলের কিন্তু দাঁড়াইবার সময় ছিল না—আপিস আছে। তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

"ভূতো যে রে, মাছ কিনেছিস দেখছি—কত ক'রে পেলি? ছ' আনা সের? ড্যাম—"

ভোম্বলদার কথা শেষ করিতে না দিয়াই ভূতো সক্ষোভে বলিয়া উঠিল—"আর বল কেন ভোম্বলদা! আমাদের মত লোকের লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়াই উচিত হয়েছে এবার। ছ' আনা সের মাছ! কিনে খেতে পারি আমরা!"

ভোম্বলদার চক্ষু কপালে উঠিল।

"ছ' আনা সের! বলিস্ কি রে! গলা কাটছে বল্!"

ভূতো বলিতে লাগিল—"আধ সের কিনেছি—এই দেখ না—কত

জোর চার-পাঁচ পিস হবে—তিন গণ্ডা পয়সা অর্থাৎ টুয়েল্‌ভ পাইস কিন্তু সাফ হয়ে গেল।"

"দিনকাল বড় খারাপ পড়স—সত্যি।"

বলিয়া ভোম্বলদা সশব্দে নস্যটা টানিয়া লইয়া নস্যাভিভূত মুখখানাকে যথাসম্ভব চিন্তান্বিত করিবার প্রয়াস পাইলেন।

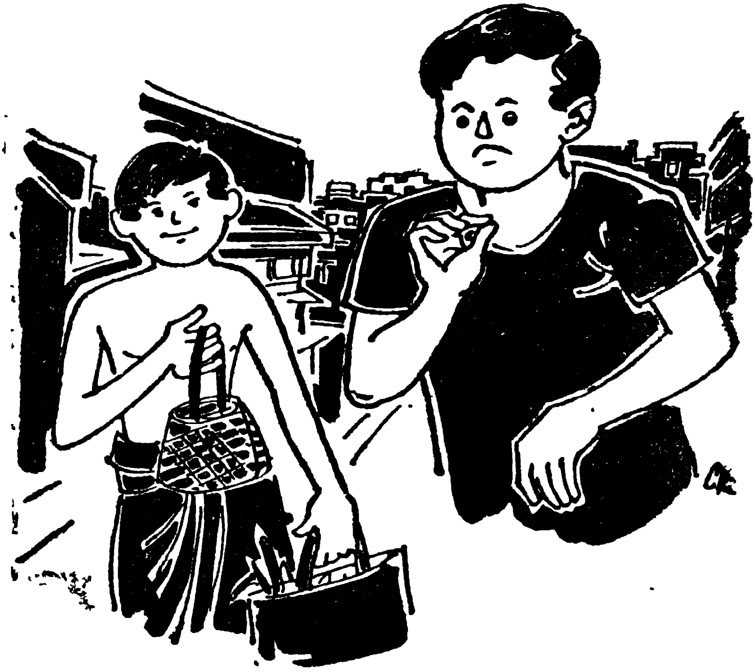

"ভুতো যে রে, মাছ কিনেছিস দেখছি—"

"এক টিপ আমাকে দাও ভোম্বলদা। আমার নাকেই ঢুকিয়ে দাও—দুটো দুটো হাতই জোড়া আমার—"

"এই যে, টান ভাল করে—"

ভোম্বলদা এক টিপ নস্য ভুতোর নাসারন্ধ্রে ধরিলেন।

জুতো যথাসম্ভব টানিয়া চলিয়া গেল।

অদূরে অক্ষয়বাবু দেখা দিলেন।

অক্ষয়বাবু কংগ্রেস-সেবক এবং উগ্র খদ্দরধারী। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির পাণ্ডা এবং সেই সূত্রে বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন।

কাছে আসিতেই করতল হইতে নস্য ঝাড়িতে ঝাড়িতে ভোম্বলদা সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—

"অক্ষয়বাবু, কাল আপনার বক্তৃতাটা সত্যিই চমৎকার হয়েছিল—যাকে বলে হৃদয়গ্রাহী। আরে, এ যে গ্র্যাণ্ড পাঞ্জাবি করিয়েছেন—খদ্দর নাকি? দেখি, দেখি—বাঃ—"

পাঞ্জাবির কাপড়টা হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে ভোম্বলদা বলিলেন,—"বাঃ! এ যে প্রায় সার্জের মতন। চমৎকার জিনিস তো!"

চক্ষু দুইটি বড় বড়-করিয়া মোটা গলায় ভবিষ্যদ্বাণী করার মতন ধরনে অক্ষয়বাবু বলিলেন,—"সার্জই হোক আর চটই হোক, খদ্দরই এখন আমাদের একমাত্র গতি—উপায় নেই এ ছাড়া—"

বলিয়া চক্ষু দুইটি হঠাৎ ছোট করিলেন। ইহা তাঁহার নিজস্ব কায়দা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলদা বলিলেন—"সে কথা আবার বলতে! দেশের জন্যে আপনারা যে প্রাণপাত করেছেন তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে দেশের বুকে। স্যাক্রিফাইস না হলে কিছু হয়? খদ্দরটা কিন্তু বেশ চমৎকার। খাপির ওপর বেশ ইয়ে—কত ক'রে গজ?"

"দেড় টাকা বোধ হয়। ঠিক মনে নেই।"

"দামেও তো এমন কিছু বেশি নয়—বাঃ।"

"ছাড়, একবার নিবারণ ঘোষালের ওখানে যেতে হবে। লোকটা শুনছি অ্যান্টিকংগ্রেস প্রোপাগাণ্ডা করছে!"

ভোম্বলদা পাঞ্জাবির কাপড়টা দেখিতেছিলেন, ছাড়িয়া দিলেন।

দেখা দিলেন দয়াময় খুড়ো। খুড়ো রাস্তার ও-পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। ভোম্বলদা হাঁকিলেন—“খুড়ো, পাশ কাটাচ্ছ যে! খবর সব ভাল তো?”

খর্বকায় বালাপোষ-আবৃত খুড়ো রাস্তা পার হইয়া আসিলেন। নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—“খবর আর কি? সূর্যচন্দ্র এখনও উঠছে, ভালর মধ্যে এই। সারা বাজারটা চুঁড়ে বিলিতি গরম মোজা এক জোড়া পেলাম না হে!”

“তাই নাকি?”

“হ্যাঁ হে। আগে সেই যে সাদা—একটু হল্‌দেটে-গোছের এক রকম মোজা আসত! একজোড়া কিনলেই নিশ্চিন্দি! প’রেও আরাম—টেকেও অসম্ভব। গত বছরের আগের বছর কিনেছিলাম একজোড়া। ঠেসে-মেড়ে দুটি বছর পায়ে দিয়েছি। এ বছর কিন্তু আর পাচ্ছি না। ঐ যে মোড়ে এক ডেঁপো ছোকরা কাটাকাপড়ের দোকান করেছে—সে তো লম্বা এক লেকচারই ঝেড়ে দিলে—বিলিতি কেনা উচিত নয়। সে কি আমাকে শেখাবি তুই? কিন্তু ওরকম মোজা বার করুক দিকি দিশি—দেখাক দিকি আমাকে!”

বলিয়া রোগা দয়াময় খুড়ো সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া দক্ষিণ হস্তটি চক্রাকারে নাড়িয়া দিলেন।

ভোম্বলদা সহাস্যমুখে কিছুক্ষণ দয়াময় খুড়োর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর কৌটা হইতে এক টিপ নস্য লইতে লইতে চাপা কণ্ঠে চুপি চুপি বলিলেন—“সব কথা চেঁচিয়ে বলতে নেই আজকাল খুড়ো—এইমাত্র অক্ষয়বাবু গেলেন। বিলিতি জিনিসের তুলনা আছে? যাকে বলে মার নেই। কাকে বলি বলুন! আজকাল অক্ষয়বাবুদেরই পোয়া বারো। দিনকাল যা পড়্‌ল ভাল জিনিস মেলাই দুর্ঘট।”

ভোম্বলদা এমন একটা মুখভাব করিলেন যেন মনের গোপন

কথাটি দয়াময় খুড়োর নিকট ব্যক্ত করিতে পারিয়া তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন।

খুড়ো বলিলেন,—"ঐ যে বললাম, আজকাল ভালর মধ্যে এই যে চন্দ্রসূর্য এখনও উঠছে। যাই, দেখি, মাড়োয়ারীদের দোকানগুলো খুঁজি একবার। থাকলে ঐ ব্যাটাদেরই ওখানে থাকবে। শীতও বেজায় পড়েছে হে! চাকরির কিছু হ'ল?"

"কই আর কিছু হ'ল!"

খুড়ো গেলেন।

আসিল ফণী।

চতুর্দশবর্ষীয় একটি বালক—স্থানীয় স্কুলে পড়ে।

তাহার সহিতও ভোম্বলদা ফুটবল খেলা লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন, তাহাকেও এক টিপ নস্য দিলেন। তাহাদের স্কুলের টীম সেদিন ম্যাচে ছয় গোলে হারিয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ যে, রেফারির পক্ষপাতিত্ব, সে বিষয়েও তাহার সহিত একমত হইলেন।

ফণী চলিয়া গেলে আসিলেন টেকো ভট্টাচার্য।

ভট্টাচার্য মহাশয় আধুনিক ছেলেছোকরাদের নিন্দাবাদে সর্বদাই শতমুখ। তিনি আসিয়াই আধুনিক ছেলেমেয়েদের ধর্মহীনতা ও স্বেচ্ছাচার প্রসঙ্গ তুলিলেন এবং ভোম্বলদার আন্তরিক অনুমোদন পাইলেন।

একটু পরেই অতি আধুনিক ছোকরা বিমল আসিল এবং ধর্মই যে জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় এবং সস্তার মধ্যে মুর্গীর ডিমই যে নির্ভেজাল শ্রেষ্ঠ খাদ্য—ইহা লইয়া আলোচনা করিল এবং সেও ভোম্বলদার সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিয়া শিস দিতে দিতে চলিয়া গেল।

এইরূপ অনেকে আসিল এবং গেল।

নস্যের টিপ হাতে ভোম্বলদা সারা সকালটা মোড়ে দাঁড়াইয়া সকলের সহিত সকল বিষয়েই একমত হইলেন।

ভোম্বলদার মনটি যেন জলবৎ—যখন যে পাত্রে রাখা যায় তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। এই জন্যই সম্প্রতি তাঁহার চাকরিটি গিয়াছে। আপিসে বড়বাবুর কাছে ছোটবাবুর সম্বন্ধে এবং ছোটবাবুর কাছে বড়বাবুর সম্বন্ধে এমন সব কথা সারল্যভাবে ভোম্বলদা ফাঁস করিয়া ফেলেন যে, উভয়েই তাঁহার উপর মর্মান্তিক চটিয়া যায়—ফলে চাকরিটি যায়।

ভোম্বলদা সকলের মন রাখিয়া কথা বলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কখনও কাহারও মন পান না। সকলেরই সকল কথায় সায় দেন, কিন্তু কেহই যেন তাঁহাকে আমল দেয় না। এমন কি, নিজের গৃহিণীও নয়। বাড়িতে সকল প্রকার আচরণের সহিত সায় দিতে গিয়া এবং পরস্পরবিরোধী কথা বলিয়া ফেলিয়া গৃহিণীর নিকট প্রায় প্রত্যহই বকুনি খান এবং অপ্রস্তুতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে ইহা লইয়া এত অশান্তির সৃষ্টি হয় যে, ভোম্বলদা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গিয়া গঙ্গার ধারে একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।

তখন ভোম্বলদার মুখখানি দেখিলে সত্যই বড় কষ্ট হয়।

তাঁহার তরল মনটি কিছুতেই যেন কোথাও আশ্রয় পাইতেছে না।

অসহায় বিপন্ন মুখচ্ছবি।

দূরে গঙ্গার ওপারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। নরম গোলগাল মুখখানি বিমর্ষ।

হাসি নাই।

ঢেউ

সেদিন খুব ভোরে খোকনের ঘুম ভেঙে গেল। মনের মধ্যে কে যেন এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল তার। ঠিক বুঝতে পারল না কি হল। এপাশ-ওপাশ করতে লাগল বিছানায়। ছোট ছেঁড়া খাটিয়ায় বিছানা তার। বিছানাটাও ছেঁড়া আর ময়লা। দুঃখের জীবন খোকনের। মা-বাবা বহুকাল আগে মারা গেছেন। দূর সম্পর্কের এক পিসের বাড়িতে মানুষ হচ্ছে সে। বয়স বছর সাতেক। লেখাপড়া এখনও আরম্ভ হয়নি। দিন-রাত পিসীমার ফরমাস খাটতে হয় কেবল। বাসন মাজা, কাপড় কাচা সব। পিসেমশাই এক বাসনের দোকানে কাজ করেন। একটা চাকরের মাথায় কিছু বাসন চাপিয়ে 'চাই বা—সো—ন' বলে পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে বেড়ান। খোকনের খুব ইচ্ছে করে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে। কিন্তু পিসীমা যেতে দেন না।

খোকন চোখ বুজেই শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর তার মনে পড়ল ঘুমই যখন আসছে না তখন বাসনগুলো মেজে ফেলা যাক। কাল রাত্রে যে থালা-বাটিগুলো এঁটো হয়েছে সেগুলো কলতলাতেই পড়ে আছে। কলে জল ছিল না বলে ধোওয়া হয়নি।

এখন হয়তো কলে জল এসেছে। বাসনগুলো ধুয়ে ফেলা যাক। কাজ চুকিয়ে রাখাই ভালো। উঠে পড়ল খোকন। বারান্দায় বেরিয়ে দেখল পিসেমশায়ের ঘরের কপাট তখনও বন্ধ। তখনও ওরা কেউ ওঠেনি। খোকন উঠোনে গিয়ে জলের কলটা ঘোরাতেই কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড হল একটা। জল বেরুল না, বেরিয়ে এল ছোট্ট একটি মুণ্ডু, একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুলসুদ্ধ! ছোট্ট কচি খুকীর মুখ।

"তুমি খোকন?"—মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলে খুকী।

"হ্যাঁ, তুমি আমাকে চেন নাকি ?"

"চিনি বইকি, যারা দুঃখী সবাইকে আমি চিনি। কতদিন এই কলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে তোমার শোবার ঘরে গিয়ে দেখেছি তুমি ঘুমুচ্ছ। তোমাকে ওঠাইনি। প্রায়ই তোমার কাছে আসি কিন্তু। আজ আমিই তোমার মনে ঢুকে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি।"

"তুমি কে ?"

"আমি পরী। আমার নাম ঢেউ।"

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। কি মিষ্টি হাসি !

"তুমি ঢেউ ? কিন্তু তোমার চেহারা তো মানুষের মতো।"

"আমি ইচ্ছে করলে যা খুশি হতে পারি ! দেখবে—"

চট করে ছোট্ট একটি পদ্মফুল হয়ে গেল মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হয়ে গেল আবার।

খোকনের বিস্ময়-সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। সে চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল খুকীর দিকে। তার একটু গা ছমছমও করছিল। ভূত নয় তো !

"না আমি ভূত নই"—মুচকি হেসে বলল সে—"আমি পরী, আমি ঢেউ, আমি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, অচেনাকে চিনতে চাই, তাই তো তোমার কাছে এসেছি—"

"কলের নল দিয়ে এলে, তুমি জলে থাক নাকি ? শুনেছি এক রকম জলপরী আছে—"

মিষ্টি হাসিতে আবার ভরে গেল তার মুখটা।

"এখন আমি জলে আছি, আমাকে জলপরী বলতে পার। কিন্তু আমি সব সময়ে জলে থাকি না। স্থলেও থাকি, আকাশেও থাকি। তোমাদের বাড়ির পাশের শিউলি গাছটাতে শিউলি ফুল হয়ে ফুটেছিলাম এক রাত্রে। তারপর দিন সকালেই ঝরে গেলাম। চলে

গেলাম আকাশে। তারাদের সঙ্গে কাটালাম কয়েক রাত্রি। এখন জলে ভেসে বেড়াচ্ছি। তোমাদের গঙ্গার জলে কিছুদিন হল এসেছি। তার আগে ছিলাম সমুদ্রে। সেখানে নানারকম অদ্ভুত কাণ্ড দেখেছি। কত রকম ঝিনুক, কত রকম মাছ, কত রকম হাঁস আর পাখি, কত রকম সাপ। নানা রঙের, নানা মাপের, নানা মেজাজের। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ছোট্ট রুপোলী পাখিটাকে ইংরেজীতে ওটার নাম সিলভার বার (Silver bar)—দেখলাম ছোট ছোট চারটি বাচ্চাকে মানুষ করছে। আর দেখেছি প্রকাণ্ড কালো চিলের মতো আকাশচারী শিকারী পাখিদের। একটার নাম রিন্‌চপ্‌স্ (Rhynchops), আমি নাম দিয়েছিলাম কালো যমদূত, আর একটা অস্‌প্রে (Osprey)—বাংলা নাম বোধহয় 'উৎক্রোশ'। কি বিশাল ডানা তাদের, বড় বড় মাছ ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে—"

খোকন বলল,—"সাগরেই না মুক্তা থাকে শুনেছি—"

"থাকে। তোমার জন্যে তিনটে ভালো মুক্তা এনেছি। যাবার আগে দিয়ে যাব। তার আগে একটা কথা বলি শোন। তুমি অত ভীতু কেন? ভয় কিসের? ভয় মিথ্যা, ভয় নেই—"

"কিন্তু আমি যে ছোট, আমি যে গরীব, আমি যে দুর্বল—"

"কিন্তু ওইটেই তো ভুল। তুমি যদি ক্রমাগত ভাব আমি ছোট, আমি দুর্বল, আমি গরীব তাহলে সত্যিই তুমি তাই হয়ে যাবে। তোমাকে ভাবতে হবে আমি বড়, আমি মহা ধনী, আমার শক্তির সীমা নেই। তাহলেই তুমি বড় হতে পারবে—"

"তাই নাকি—"

"তুমি নিজেই জান না তুমি কে! সেইটে জানতে চেষ্টা কর। তাহলেই তোমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে। এইকথা বলতেই আমি এসেছি।"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খোকন।

"তোমার নাম ঢেউ?"

"হ্যাঁ, আমি জলের ঢেউ, হলের ঢেউ, আকাশের ঢেউ, শব্দের ঢেউ, আলোর ঢেউ, ইথরের ঢেউ, ঝড়ের ঢেউ, আবার মৃদু হাওয়ারও

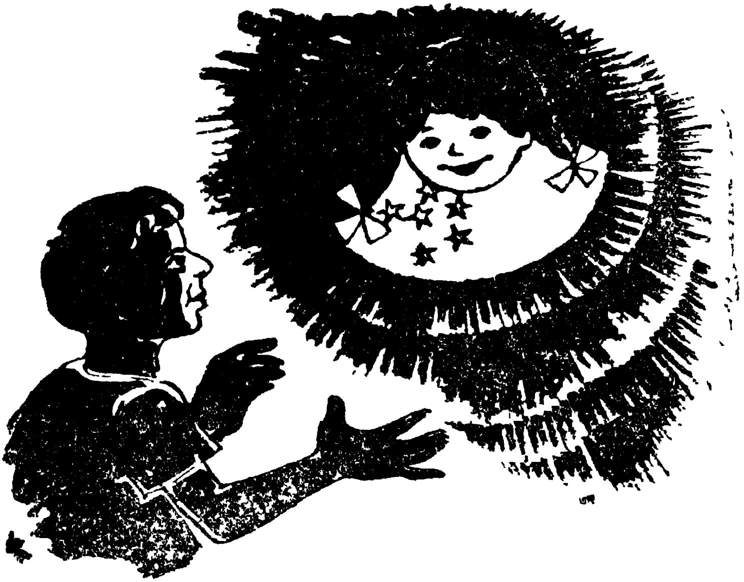

হঠাৎ খুকী রূপান্তরিত হল একটা জ্যোতির্ময় আলোক-শিখায়

ঢেউ। রেডিওতে তোমরা আমারই গলা শোন, আলোতে তোমরা আমাকেই দেখ, আমিই বহন করে আনি গান আর গর্জন! যে মহাকাশযাত্রীরা এখন আকাশ-পরিক্রমা করছেন আমি তাঁদের সঙ্গে আছি—"

হঠাৎ খুকী রূপান্তরিত হল একটা জ্যোতির্ময় আলোক-শিখায়। খোকন সবিস্ময়ে দেখল তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে অপূর্ব শিহরণে।

"ঢেউ, ঢেউ, তুমি কোথা গেলে—"

চিৎকার করে উঠল খোকন।

"এই যে আছি—"

শিখা আবার রূপান্তরিত হল খুকীতে।

"তুমি কি এখনই চলে যাবে? আমার ঘরে এসনা একবার।"

"আমি বেশিক্ষণ একজায়গায় থাকতে পারি না। এখনই চলে যেতে হবে আমাকে। এই নাও—"

"কি—"

"এই মুক্তা তিনটে এনেছিলাম তোমার জন্যে, নাও ধর—। এরা সাধারণ মুক্তা নয়, এর একটি সত্য, আর একটি শিব আর একটি সুন্দর। এদের খুব মুঠো করে চেপে ধর। এরা তোমার মুঠোর মধ্যে মিলিয়ে যাবে। প্রবেশ করবে তোমার দেহে, মনে, কল্পনায়।"

খোকন মুক্তা তিনটি হাতে মুঠো করে দাঁড়িয়ে রইল সবিস্ময়ে। একটু পরে মুঠো খুলে দেখল হাত খালি। মুক্তা তিনটে অন্তর্ধান করেছে।

"বাঃ!"

হাততালি দিয়ে উঠল ঢেউ।

"এইবার দেখো, কি হয়। আমি চললুম।"

জলের কলের ফাঁক দিয়ে যেমনি এসেছিল তেমনি চলে গেল।

হতে পারে একটা স্বপ্ন।

খোকন কিন্তু অস্বীকার করে। সে বলে প্রত্যক্ষ দেখেছিল সে।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। খোকন সত্যিই বড়লোক হয়েছে। তার অসামান্য প্রতিভাবলে অসাধারণ চরিত্রমাধুর্যে উ[illegible]

করেছে দেশের মুখ। তার প্রতিভার সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে দেশে-বিদেশে। সে আজ দেশের গৌরব।

একদিন সে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। চেয়ে ছিল সমুদ্রের দিকে। তার মনে হল সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউ তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

জন্মান্তর

অলকাপুরীর আদুরে আর খামখেয়ালী রাজকুমারের মনে সুখ নেই। সে যে কি চায়, কি পেলে যে তার মনের সুখ হবে তা সে নিজেও জানে না। কেবল খুঁতখুঁত করে। ঐশ্বর্যের অভাব নেই। বিলাস অফুরন্ত, কিন্তু তবু তার মনে হয় কি যেন নেই যার অভাবে সবই ফিকে হয়ে গেছে।

কি সে জিনিস? ধরতে পারে না রাজকুমার।

রোদের আলো-ঝলমল-পোশাক দু'দিন পরেই খারাপ লাগে, তখন তৈরি হয় জ্যোৎস্নার তৈরি নতুন পরিচ্ছদ। তা-ও পুরনো হয়ে যায় কয়েকদিন পরে।

তাদের বাগানে পারিজাত ফোটে, ফোটে আরও অসংখ্য রকমের ফুল, গান করে বিচিত্রবর্ণ অনেক পাখি, তাদের অপূর্ব গানে ঝংকৃত হয় ঝরণায় আনন্দ। স্বর্গের অপ্সরীরা খেলা করতে আসে রাজকুমারের সঙ্গে। তাদের রূপ, তাদের হাসি, তাদের লীলায়িত নৃত্য-ভঙ্গী চমৎকার। তাদের কেউ যেন প্রজাপতি, কেউ রঙিন ফানুস, কেউ অপরূপ-কান্তি ভ্রমর! দু'দিন পরেই কিন্তু রাজকুমার অন্যমনস্ক হয়ে যায়, কিছু ভালো লাগে না তার। ম্রিয়মাণ হয়ে ভাবে—সবাই একঘেয়ে। কতদিন এসব আর ভালো লাগে।

রাজকুমারের পরিচারক-সহচর ব্যস্ত হয়ে ওঠে রাজকুমারের মলিন মুখ দেখে। চেষ্টা করে তাকে নতুন পরিবেশে নিয়ে যেতে। নতুন রকম গান, নতুন রকম দৃশ্য, নতুন কিছু করার চেষ্টা করে সে। কিছুদিন কুমারের মনের প্রসন্নতা ফিরে আসে। কিন্তু তা বরাবর থাকে না। আবার সে যেন কেমন উদাস হয়ে যায়।

একদিন সে নদীর তীরে বসে আকাশের দিকে চেয়েছিল। পাশে সহচর বসে বাঁশিতে বাজাচ্ছিল একটা মন-মাতানো সুর। সুরটা

নতুন ধরনের। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে রাজপুত্র শুনছিল সেই সুর। খুব ভাল লাগছিল।

"কোথায় এ সুর শিখলে সহচর? চমৎকার তো!"

"পার্বতী পাহাড়ে এক কিন্নর আছেন। তিনিই শিখিয়েছেন।"

"চমৎকার!"

বাঁশি থামিয়ে সহচর বললে, "তিনি সাধারণ কিন্নর নন, তিনি সাধক। তাঁর গানে পাথর গ'লে জল হয়। তিনি গান গেয়ে পাখিকে ফুলে রূপান্তরিত করেন, ফুলও তাঁর গান শুনে পাখি হয়ে যায়। অদ্ভুত গুণী।"

হঠাৎ রাজকুমার বলে ওঠে,—"দেখ, দেখ, আকাশে কি কাণ্ড হচ্ছে।"

সহচর চোখ তুলে দেখল আকাশে বিরাট একটা মেঘের প্রাসাদ তৈরি হয়েছে। সাতমহলা প্রাসাদ। বড় বড় খিলান, গম্বুজ, মিনার, মিনারেট সব আছে তাতে।

রাজকুমার বললে, "আমাদের স্ফটিকের প্রাসাদ এর কাছে তুচ্ছ। আহা আমি যদি ওই রকম মেঘের প্রাসাদে বাস করবার সুযোগ পেতুম।"

মেঘের প্রাসাদ ক্রমশঃ রূপ বদলাতে লাগল। তার গম্বুজ, মিনার, মিনারেটগুলো যেন বেঁকে বেঁকে যেতে লাগল ক্রমশঃ। দেখতে দেখতে সেগুলো হয়ে গেল ঠিক হাতির শুঁড়ের মতো। প্রাসাদ গেল মিলিয়ে, মনে হতে লাগল একদল হাতি যেন জড়াজড়ি করে শুঁড় তুলে আনন্দ করছে। হাতির দলও রইল না। ক্রমশঃ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল সব। খানিকটা হল প্রকাণ্ড হাঁস, খানিকটা কুমির, কিছু কিছু অংশ টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল নীল আকাশে বরফের দ্বীপের মতো। খানিকটা হয়ে গেল পেঁজা-তুলোর বিরাট স্তূপ।

সবিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল রাজকুমার। তার মন ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল মেঘের সঙ্গে। তারপর সহচরের দিকে ফিরে বললে, "ভাই, মানুষ হয়ে সুখ নেই। মেঘ হয়েই সুখ।"

"কেন ?"

"মেঘ কেমন বদলাতে পারে। প্রাসাদ থেকে হাতির দল হয়ে যেতে পারে অনায়াসে। তারপর হাঁস, কুমির, কত কি! আহা, যদি মেঘ হতে পারতুম! নিস্তার পেতাম এই একঘেয়ে জীবন থেকে।"

তারপর হঠাৎ সে উঠে বসল। একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ সহচরের মুখের দিকে।

"তুমি এখনি বললে না পার্বতী পাহাড়ের সেই কিন্নর গান গেয়ে পাথরকে জল করে দেয়। পাখিকে ফুলে রূপান্তরিত করে। সে কি আমাকে মেঘ করে দিতে পারবে ?"

"তাতো জানি না। খামখেয়ালী মানুষ, কি করবে তা আগে থাকতে বলা শক্ত।"

"চল এক্ষুণি যাই তাঁর কাছে—"

আগ্রহে অধীর হয়ে উঠল রাজকুমার।

"এখন ? তিনি থাকেন পার্বতী পাহাড়ের চূড়ার কাছে একটা গুহার ভিতর। গুহার সামনে খানিকটা জায়গা আছে, সেইখানে এসে বসেন মাঝে মাঝে আর গান করেন। এখন গেলে সেখানে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। তোমার বাবা-মা ভাববেন না ?"

"মা-বাবাকে একটা খবর দিয়ে যাই চলে। মল্লিনাথকে বলে যাই আমরা শিকারে বেরুচ্ছি, ফিরতে হয়তো একটু দেরি হবে, বাবা-মা যেন না ভাবেন।"

মল্লিনাথ বাগানের মালী।

তাই হল। তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুজনে পার্বতী পাহাড়ের উদ্দেশে।

দুই

পার্বতী পাহাড়ে ওঠা সহজ নয়। সোজা খাড়াই ভেঙে উঠতে হয় পাথর আঁকড়ে আঁকড়ে। পায়ে চলার পথ নেই, কারণ পার্বতী পাহাড়ে কেউ ওঠে না। যে কিন্নর ওখানে থাকেন তাঁর ভয়ে কেউ যায় না সেখানে। পাহাড়ের আশে-পাশে কয়েকটা পাহাড়ী ছাগল দেখা যায়। একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। বেশ বলিষ্ঠ বড় ছাগল। জনশ্রুতি, ওরা নাকি মানুষ ছিল, কিন্নর ওদের ছাগল করে দিয়েছেন। ওরা আগে ডাকাত ছিল, ছাগল হয়ে ওদের স্বভাবেরও পরিবর্তন হয়েছে। এখন বেশ শান্তশিষ্ট।

কিছুদূর উঠে রাজকুমার আর সহচর বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হাত-পা আর যেন চলছে না। দুজনে দুটো পাথরের উপর বসে হাঁপাতে লাগল। আশ্চর্য, একটু পরেই দুজনের কাছে দুটো ছাগল এসে দাঁড়াল। বেশ বলিষ্ঠ এবং বড়, প্রায় টাট্টু ঘোড়ার মতো। তারা এসে কাছে দাঁড়িয়ে উৎসুক নেত্রে চেয়ে রইল তাদের দিকে। যদিও কথায় তারা কিছু বলল না, কিন্তু তাদের চোখের দৃষ্টি যেন বলতে লাগল, "ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? আমাদের পিঠে চড় না। পৌঁছে দেব তোমাদের কিন্নরের কাছে।"

রাজকুমার এবং সহচর চাইল পরস্পরের দিকে। দুজনের মনেই ছাগলের নীরব আমন্ত্রণ পৌঁচেছে বোঝা গেল। কালবিলম্ব না করে ছাগল দুটোর পিঠে বসল দুজনে।

পার্বতী পাহাড়ের শিখরের কাছে যখন পৌঁছল তারা, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু তারা সবিস্ময়ে দেখল যে গুহাটার ভিতর কিন্নর থাকেন সেই গুহাটার ভিতর থেকে আলো বেরুচ্ছে। আলো আর গান। গানই অন্ধকারকে আলোকিত করে তুলেছে যেন। চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু গুহার সামনে স্বচ্ছ দিনের

আলো। ছাগল দুটো গুহার একটু দূরেই নামিয়ে দিল তাদের। গুহার খুব কাছাকাছি আর গেল না তারা। সম্ভবতঃ যাওয়ার সাহস হল না।

তিন

গুহার সামনে গিয়ে রাজকুমার আর সহচর সেই আলোকিত স্থানটায় চুপ করে বসে রইল। অন্ধকার-গলানো অদ্ভুত সুর ভেসে আসছে ভিতর থেকে। কখন যে তাদের চোখ বুজে গেছে, কখন যে তারা কৃতাঞ্জলি হয়েছে তা' তারা নিজেই জানে না।

অনেকক্ষণ পরে মেঘমন্দ্রকণ্ঠে প্রশ্ন হল, "কে তোমরা, কি চাও ?"

রাজকুমার চোখ খুলে দেখল সৌম্যকান্তি এক দিব্যপুরুষ গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, পদ্মপলাশ নয়ন থেকে করুণাময় দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সমস্ত শরীর থেকে বেরুচ্ছে অপরূপ আলোর জ্যোতি। এই অনবদ্য আবির্ভাবের দিকে চেয়ে রাজকুমার রুদ্ধবাক্ হয়ে গেল।

সহচর বললে, "প্রভু, ইনি অলকাপুরীর রাজকুমার। অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও এঁর জীবনে কোন সুখ নেই। তাই ইনি মেঘ হতে চান। এঁর বিশ্বাস সতত পরিবর্ত্তনশীল মেঘরূপে ইনি জীবনের পূর্ণ স্বাদ পাবেন।"

কিন্নর বললেন, "বেশ। মানুষকে মেঘে পরিণত করতে হলে প্রথমে তার দেহকে ছিন্নভিন্ন করতে হয়। আমি মন্ত্রবলে বাঘকে ডাকছি, সে এসে আগে তোমাদের দেহকে ছিন্নভিন্ন করুক। তারপর আমি তার থেকে মেঘ সৃষ্টি করব।"

এই বলে তিনি শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে এক স্তব আওড়াতে লাগলেন গম্ভীরকণ্ঠে। স্তব থামতে না থামতেই এক বিরাটকায় ভীষণ বাঘ এসে সামনে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দুদ্দাড় করে ছুটে

পালাল সহচর। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে বাঘের মুখে পড়তে হবে তা সে ভাবে নি।

রাজকুমার কিন্তু নড়ল না। স্থির হয়ে বসে রইল সে।

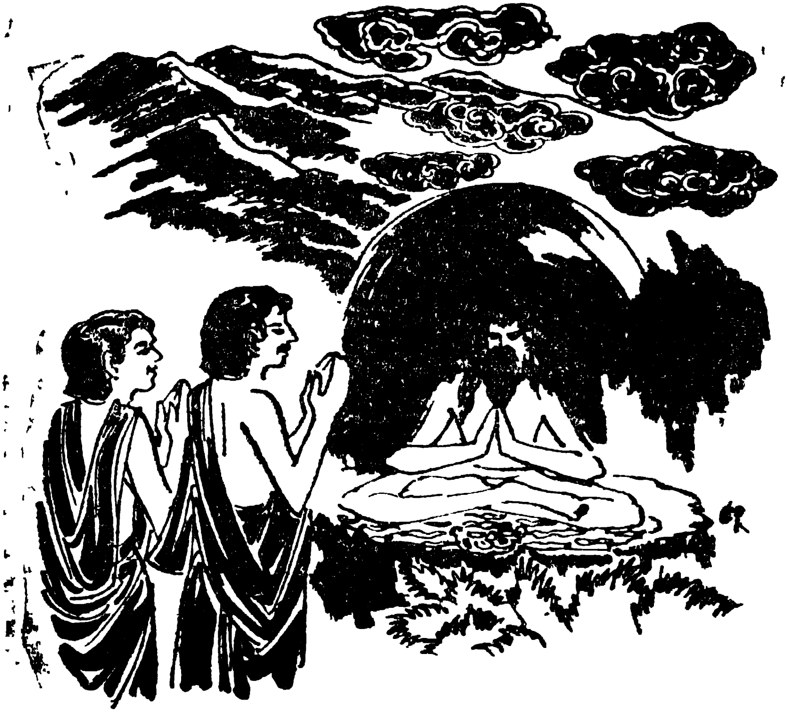

"কে তোমরা, কি চাও?"

কিন্নর বললেন, "বাঘের মুখে নিজেকে সমর্পণ কর!"

"আমি প্রস্তুত হয়েই আছি, বাঘকে আদেশ দিন, সে আমাকে ছিন্নভিন্ন করুক।"

হঠাৎ কিন্নর হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন। বাঘ অন্তর্ধান করল।

তখন তিনি কুমারকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমার সাহস

দেখে খুশি হয়েছি। তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব। তুমি পদ্মাসনে ভাল করে বসে মেঘের চিন্তা কর। আমি গান গাইছি।"

রাজকুমার পদ্মাসনে বসে মেঘের চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্নর যে গান ধরলেন তা অপূর্ব। তা আকাশের গান, হাওয়ার গান, মুক্তির গান, ব্যাপ্তির গান।

রাজকুমার ক্রমশঃ মেঘে রূপান্তরিত হয়ে আকাশে চলে গেল। ভাসতে লাগল সেখানে। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রদের আলো গায়ে লাগল। রামধনু মূর্ত হল তাকে ঘিরে। অসীম মুক্তি, অনাবিল আনন্দের আভাস পেল রাজকুমার।

ক্রমশঃ অন্য মেঘেদের সঙ্গে ভাব হল।

স্তর, স্তূপ, পালক, কোদাল কুড়ুলে রঙ্গিন, কালো বরফের মতো সাদা—নানারকম মেঘ ভেসে ভেসে এল তার কাছে। শুনল তার কাহিনী। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল তারা।

বলল, "মানুষ ছিলে, মেঘ হয়েছ! এ কি তোমার পাগলামি।"

"আমি আকাশে থাকতে চাই।"

"আকাশে কি বেশি দিন থাকতে পারবে? জল হয়ে ঝরে পড়তে হবে পৃথিবীতে। পৃথিবীর সেই জল সূর্যের তাপে আবার বাষ্প হয়ে যাবে। আবার মেঘ হবে তুমি। এই একঘেয়ে জীবন চলবে চিরকাল!"

শুনে অবাক হয়ে গেল রাজকুমার।

মানুষের জীবনের মতো মেঘের জীবনও তাহলে একঘেয়ে।

চার

রাজকুমার যেদিন জল হয়ে পৃথিবীতে নামল সেদিন এক অদ্ভুত বর্ষার দিন। ঝরঝর করে রাজকুমার ঝরে পড়ল এক গরিব কৃষকের আঙ্গিনায়।

সবটা এক জায়গায় পড়ল না।

খানিকটা মাটিতে শুষে গেল, খানিকটা পড়ল একটা ভাঙা হাঁড়িতে, খানিকটা পড়ল পিছনের পুকুরে।

যেখানেই পড়ুক রাজকুমারের মন কিন্তু ঘুরতে লাগল কৃষকের কুটিরকে কেন্দ্র করে। দেখত সকালে উঠে দীনু (কৃষকের নাম) বাসি ভাত খেয়ে লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে চলে যেত মাঠে। তার বউ পারুল ঘরের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ঘর নিকোত, উঠোন ঝাড়ু দিত, গোয়াল পরিষ্কার করত, ঘুঁটে দিত, ঢেঁকিতে পাড়ও দিত, মাঝে মাঝে। তারপর উনুন জ্বেলে রান্না করতে বসত। সর্বদা ব্যস্ত।

আর তার ছেলে কানু, পাঁচ ছ'বছর বয়স, কিন্তু সেও সর্বদা ব্যস্ত। ধুলো-কাদা নিয়ে খেলা করছে, কাগজে নেকড়ার ফালি বেঁধে ঘুড়ি উড়াচ্ছে, একটা নেকড়ার বল নিয়ে ছুটোছুটি করছে, মায়ের কাছ থেকে মার খাচ্ছে, বকুনি খাচ্ছে—কিন্তু তার আনন্দের সীমা নেই। বাড়ির গাই বুধির একটা বাচ্চা হয়েছে, তার সঙ্গে বড় ভাব। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে যায়। একদিন পড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটে গেল। কিন্তু তবু সে সদানন্দময়।

এ জীবন রাজকুমার আগে কখনও দেখে নি, দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

পাঁচ

পৃথিবীতে থাকার মেয়াদ ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসতে লাগল তার।

গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল, সূর্যের তাপ বাড়তে লাগল।

আবার সে মেঘ হয়ে চলে গেল আকাশে। কত দেশের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে বেড়াল, কত দেশে জল হয়ে নামল আবার। সাহারার মরুভূমিতেও একবার গিয়ে পড়েছিল। কয়েক ঘণ্টা ছিল

মাত্র। অনেকক্ষণ ছিল চেরাপুঞ্জীতে। আফ্রিকার জঙ্গলের অভিজ্ঞতাও আছে।

মিসিসিপি, গঙ্গা, অ্যামাজন নদীর স্রোতে সে গা ঢেলে অনেক দিন বেড়িয়েছে। সমুদ্রের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বিরাট পৃথিবীর বিশাল বিচিত্র রূপের অনন্ত শোভাও দেখেছে সে। তার মেঘের শরীর জল হয়ে গলে পড়ে, সেই জল আবার মেঘ হয়। এই করে অনেক দিন কেটে গেল। একটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে। তার শরীর বদলায় কিন্তু মন বদলায় না।

একদিন হঠাৎ সে আবিষ্কার করল, মেঘরূপে যে গিরিশৃঙ্গের উপর সে রয়েছে সেটা পার্বতী পাহাড়ের শৃঙ্গ। আর একটু নীচে নেমে সে কিন্নরের গুহাটাও দেখতে পেল। দেখল, গুহার সামনের ফাঁকা জায়গাটায় বসে কিন্নর বীণা বাজাচ্ছেন। সুরের ফুলকিতে ভরে গেছে চারিদিক।

আর একটু নেমে এসে রাজকুমার বললে, "প্রভু, মেঘজীবন থেকে আমাকে মুক্তি দিন। এ রকম ভেসে ভেসে বেড়াতে আর ভালো লাগছে না।"

বীণাবাদন থেমে গেল।

"বেশ, আবার কি অলকাপুরীতে ফিরে যাবে?"

"না, আমি বাংলাদেশের সেই কৃষকের ঘরে ছেলে হয়ে জন্মাতে চাই।"

ছয়

গভীর রাত্রি।

কৃষকের বউ হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। তারপর কৃষককে ঠেলে উঠাল।

"ওগো, শুনছ, বাইরে কচি ছেলের কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখ দিকি—"

কৃষক আলো জ্বেলে বাইরে এসে দেখল একটি অনিন্দ্যকান্তি শিশু তাদের বাড়ির উঠোনের মাঝখানে শুয়ে কাঁদছে।

"কার ছেলে! কোথা থেকে এল—"

কৃষকের বউ বললে,—"আহা, আগে ঘরে নিয়ে যাই চল। ওর ক্ষিদে পেয়েছে, শীতে কাঁপছে।" বুকে করে কৃষক-বউ নিয়ে গেল তাকে ঘরের মধ্যে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিন্তু সন্ধান পাওয়া গেল না ছেলে কার।

কৃষকের বউ বললে,—"আমি বুঝতে পেরেছি এ কে। আমার কানুই ফিরে এসেছে আমার কাছে।"

মাস দুই আগে কানু কলেরায় মারা গিয়েছিল।

যাদুঘর

খোকনের বয়স বছর পনেরো। ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছে। আলাদা বাইরের ঘরে শোয় সে। সেইটে তার পড়ার ঘর, শোবার ঘর দুই-ই।

বাইরের বারান্দায় পুরোনো চাকর বিশু শোয়।

বাইরের ঘরের পাশে আর একটি ছোট ঘর আছে, রাস্তার দিকে। সেটির দেওয়াল পাকা, কিন্তু ছাদ টালির। তাতে কেউ শোয় না। বাড়ির পুরোনো ভাঙা জিনিসপত্রে সে ঘরটি ভরতি। অনেক রকম জিনিস আছে তাতে। খোকন এ ঘরটির নাম দিয়েছে যাদুঘর।

কত কি যে আছে ও-ঘরে। সমুদ্রের ফেনা, জতু শিলা, ভাঙা শিল-নোড়া, কত কি। অদ্ভুত চেহারা বেঁটে-মোটা একটা কালো লাঠি আছে, তার মধ্যে নাকি তলোয়ার থাকত এককালে। ওর নাম লাঠি নয়, গুপ্তি। ঠাকুরদা নাকি ব্যবহার করতেন।

বাবারও যৌবনকালের অনেক স্মৃতি আছে ওখানে। বাবা যৌবনে নাকি অম্বুরি তামাক খেতেন। এখন তামাক খান না। চুরুট খান। পুরোনো ভাঙা গড়গড়াটি কিন্তু এখনও আছে ওখানে।

বাবা যৌবনে মাছ ধরতে যেতেন। একবার একটা ভয়ানক কুমিরের পাল্লায় পড়েছিলেন। মা খুব নাকি কান্নাকাটি করেন। মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বাবা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর মাছ ধরতে যাবেন না। মায়ের সামনে ছিপটি দু' আধখানা করে ভেঙে ফেলেন। সেই ভাঙা ছিপটি আর মাছ ধরার 'হুইল'টি ওই ঘরের এক কোণে আছে এখনও।

আরও আছে নানারকম জিনিস। একটা কালো পাথরের ভাঙা থালার টুকরো আছে। ওই পাথরের থালায় ঠাকুমা নাকি আমসত্ত্ব দিতেন।

জং-ধরা অদ্ভুত ধরনের চালুনিও আছে একটা। তা দিয়ে ঠাকুমা নাকি তালের মাড়ি বার করতেন। ঠাকুমারই এ সব শখ ছিল। নারকেলের গঙ্গাজলী করতেন, 'চিরা-জিরা' করতেন, মুলোর অম্বল রাঁধতেন পায়েসের মতো করে। কাঁথার ওপর কল্কা দিয়ে কাজ করতেন। তিতার ডাল রাঁধতেন।

পূর্ববঙ্গের মেয়ে ছিলেন তিনি। পদ্মা-মেঘনার ওপারে তাঁর বাপের বাড়ি ছিল। ময়ূরমুখো নৌকো চড়ে বাপের বাড়ি যেতেন। তিনদিন নাকি নৌকোয় থাকতে হত।

বাবার কাছে এসব গল্প শুনেছে খোকন। খোকন ঠাকুমাকে দেখে নি। তাঁর ফোটো দেখেছে। বেশ মোটা-সোটা কালো-কোলো ছিলেন। মাথায় ঘোমটা। মুখে লাজুক হাসি।

মায়েরও নানারকম শখ আছে। আর সে সবের চিহ্নও আছে ওই যাদুঘরে। মায়ের শখ একেলে শখ। কেক, বিস্কুট, জ্যাম, জেলি, পুডিং বানাতে তিনি সিদ্ধহস্ত।

যাদুঘরে একটা বিলিতি 'বেকিং ওভেন' পড়ে আছে এখনও। তার চারদিকে মাকড়শারা অদ্ভুত জালের দুর্গ বানিয়েছে একটা। আর এক কোণে জমা করা আছে ভাঙা-ভাঙা কেকের ছাঁচ, আর সন্দেশের ছাঁচ।

মায়ের ওসব করবার শখ মিটে গেছে। বলেন, ভালো ময়দা, মাখন, দুধ কিছু পাওয়া যায় না, তাছাড়া তোমরা খেতেও চাও না। কত আর বিলিয়ে দেব।

মা আজকাল উল বোনা নিয়ে মত্ত। নানা প্যাটার্নের আর নানা রঙের স্লিপ-ওভার, কার্ডিগান আর সোয়েটার বুনে চলেছেন।

বোনবার দু'চারটে ভাঙা কাঁটাও যাদুঘরে আশ্রয় পেয়েছে একটা নড়বড়ে শেলফের ওপর।

কিছুদিন আগে মায়ের কার্পেটের আসন বোনার শখ হয়েছিল। সে শখও মিটে গেছে। ভাঙা ফ্রেমটা যাদুঘরে পড়ে আছে।

এ ছাড়া আছে কয়েকটা ভাঙা বালতি আর ড্রাম, আর সে সবের ভেতর কত কি যে পোরা আছে তার ইয়ত্তা নেই। পুরোনো পেরেক, ইস্ক্রুপ, ছুরির বাঁট, সেকেলে ক্ষুর, আসল চিনেমাটির ফাটা নীল কেতলি, কয়েকটা ভাঙা রবার স্ট্যাম্প, আতরের শিশি, আরও কত কি। শক্ত লোহার জাল দিয়ে মোড়া একটা মোটা কাচের মজবুত শিশিও আছে একটা বালতির মধ্যে ; তার মাথায় শিরস্ত্রাণের মতো নিকেলের একটা টুপি। ওটা দিয়ে সোডাওয়াটার তৈরি হত নাকি এককালে।

তাছাড়া বড় বড় দুটো দেওয়াল ঘড়ি আছে ও-ঘরে। একটা ঘড়িতে একটি মাত্র কাঁটা। কাচ নেই। আর একটা ঘড়িতে দুটো কাঁটাই আছে, কাচও অক্ষত। তার পেণ্ডুলাম বন্ধে ঘড়ির চাবিটাও আছে। ঘড়ি কিন্তু চলে না। সাহেব বাড়ি থেকে নাকি ফেরত দিয়ে বলেছে এ ঘড়ি সারাতে দেড়শ টাকা লাগবে। না সারিয়ে নতুন একটা কেনাই ভালো।

খোকন একদিন রবিবার দুপুরে ঘড়িটাকে খুলে একটু নাড়া-চাড়া করতে গিয়েছিল। দম দিতেই কর্‌কর্‌ করে একটা শব্দ হল, তারপর ঢং ঢং ঢং করে বেজে উঠল। যেন ধমকে উঠল খোকনকে। ভাবটা যেন—কেন বিরক্ত করছ আমাকে। তারপর থেকে খোকন ও-ঘড়িতে আর হাত দেয়নি।

বালতির ভেতর থেকে কয়েকটা জিনিস কিন্তু সংগ্রহ করেছে সে। একটা তেকোণা জেট-পাথরের টুকরো, ছোট্ট আতরের শিশি একটা, একটা চমৎকার দোয়াত। ঢাকনিটা যদিও নেই, কিন্তু চমৎকার সবুজ রঙের কাট্‌গ্লাসের তৈরি।

এক কোণে দুটো তোরঙ্গ আছে। নানারকম বইয়ে ঠাসা। সেকালের বই। খোকন একটারও নাম শোনে নি। শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী, হরিদাসের গুপ্তকথা, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, কালাচাঁদ, নীলবসনা সুন্দরী প্রভৃতি। খোকন দু'একটা নিয়ে পড়বার চেষ্টা করেছিল, ভালো লাগে নি। ওসবের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ঢের ভালো লাগে তার। বই ছাড়া মাসিক পত্রও আছে নানারকম। বঙ্গদর্শন, বান্ধব, সুপ্রভাত, মালঞ্চ—এগুলোও উলটে পালটে দেখেছিল খোকন। ভালো লাগেনি। শক্ত শক্ত প্রবন্ধ কেবল।

এসব ছাড়াও আরও আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস আছে যাদুঘরে। একটা নল-ওলা সবুজ রঙের কুঁজো আছে একটা তাকের উপর। নলটি যদিও ভেঙে গেছে কিন্তু গায়ে কি চমৎকার কাজ করা!

জরি দেওয়া কালো মখমলের ছেঁড়া টুকরোও আছে খানিকটা বাক্সে। একটা জরির ছেঁড়া টুপিও।

বাবা এককালে নাকি থিয়েটার করতেন। নিজেই রামের পোশাক কিনেছিলেন একটা। এই টুকরোটা নাকি তারই স্মৃতিচিহ্ন। খোকন ওটাকে নিজের পড়ার টেবিলক্লথ করে পাততে চেয়েছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত পাতে নি। প্রথমতঃ ছোট হল, দ্বিতীয়তঃ বেমানান হল। রাজা রামচন্দ্রের গায়ে যা মানিয়েছিল, কাঠের টেবিলের ওপর তা মানালো না। তাছাড়া ভয় হল, দেখতে পেলে বাবা বকবেন।

লক্ষ্মীর সিঁদুর-চুপড়ি ছিল একটা বালতিতে। সেটি সংগ্রহ করেছে খোকন। যদিও তার গায়ের কয়েকটা কড়ি নেই তবু এখনও চমৎকার দেখতে। খোকন সেটি এনে রেখেছে তার বইয়ের আলমারির ভেতর। টুকিটাকি সব জিনিস রাখে তাতে। ছুরি, আল্‌পিন, সেফ্‌টিপিন এই সব।

অবসর পেলেই ওই যাদুঘরে ঢুকে পড়ে খোকন একবার একটা বাক্সের ভেতর ময়ূরের পালক পেয়েছিল দুটো। আশ্চর্য, ময়ূরের পালক

কি করে গেল ওখানে ! মাকে জিজ্ঞাসা করে আরও অবাক্ হয়ে গেল সে । মা নাকি ময়ূরের পালক দিয়ে পাখা তৈরি করত এককালে !

কত রকম অদ্ভুত জিনিসই যে আছে ওখানে । একটা পুরোনো বাক্সে গাদা গাদা চিঠি আছে । কত রকমের চিঠি । একটা চিঠিতে দেখেছিল—হাবুল দাদু, তোমার জন্যে বড্ড মন কেমন করছে। তোমার জন্যে নিখুঁতি যোগাড় করে পাঠাব । একটা ভালো দোকানে অর্ডার দিয়েছি । তোমার আবৃত্তি এখনও কানে বাজছে। তুমি রবীন্দ্রনাথের 'বন্দীবীর'টাও মুখস্থ কোরো । ওটা তোমার গলায় বেশ মানাবে । এবার গিয়ে শুনব । চিঠির নিচে নাম লেখা ছিল, তোমার বাঁকুড়ার দাদু ।

মাকে চিঠিটা দেখিয়েছিল খোকন। মা বললেন, ছেলেবেলায় তোমার বাবাকে হাবুল বলে ডাকত সবাই। বাঁকুড়ার দাদু লোকটিকে কিন্তু চিনতে পারলেন না মা। বলছেন, কত সব আত্মীয়-কুটুম্ব চারদিকে ছড়িয়ে আছে, সবাইকে কি চিনি ?

বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন। বাবাও ভুরু কুঁচকে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—ও, মনে পড়েছে। বাবার এক পিসতুতো ভাইয়ের কাকা বাঁকুড়ায় থাকতেন। চমৎকার লোক ছিলেন। পায়ে ঘুঙুর পরে বাউলের গান গেয়ে নাচ দেখাতেন আমাদের। আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে এসে ছিলেন কিছুদিন।

এইরকম সব অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কৃত হয় ওই যাদুঘরে । বাবার নাম যে হাবুল ছিল কে জানত !

ওই যাদুঘরেই আর এক কাণ্ড হল একদিন !

ঘটনাটা ঘটল দিনে নয়, রাত্রে । মাঝ রাত্রে । সেদিন হঠাৎ খোকনের ঘুমটা ভেঙে গেল । টং টং করে দুটো বাজল পাশের ঘরে । খোকনের চোখ বুজে তবু শুয়ে রইল কয়েক মিনিট । যদি ভাঙা ঘুমটা আবার জোড়া লেগে যায় ।

কিন্তু লাগল না। পাশের ঘরে—মানে, ওই যাদুঘরে, খুট খুট আওয়াজ হতে লাগল একটা। ইঁদুরের শব্দ ? না।

মনে হল কে যেন চলে বেড়াচ্ছে। বিছানায় উঠে বসল খোকন। অবাক্ হয়ে গেল পাশের ঘরের দরজাটার দিকে চেয়ে। দরজার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। জোর আলো। চোর কি ? চোর কি অত আলো জ্বেলে আসবে ? বিছানা থেকে নেমে পড়ল খোকন। কপাটটা খুলে দেখবে ? তার ভয় করছিল না ঠিক। বরং একটা অদ্ভুত আনন্দে ভরে উঠেছিল সারা বুক। মনে হচ্ছিল অপূর্ব অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটছে ওঘরে—কপাটের ওপারে।

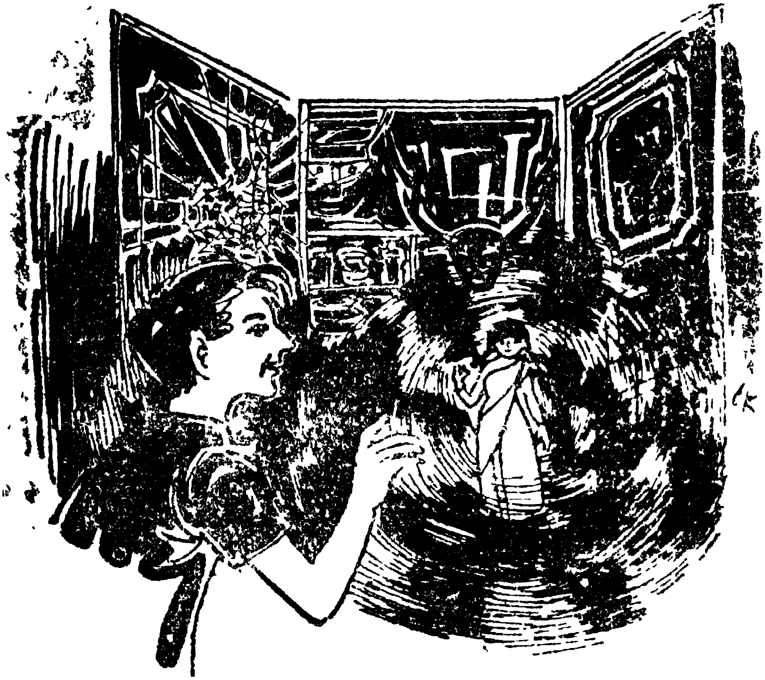

—"কে তুমি ?"

কপাট খুললেই হয়তো অন্তর্ধান করবে সব। তার পরই কান্নাটা শোনা গেল। হ্যাঁ, চাপা কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যেন কাঁদছে কেউ। কপাট খুলে অবাক হয়ে গেল খোকন।

ঘরের কোণে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না। গায়ের ওড়না, পরনের কাপড় সবই জ্যোৎস্না। মাথার চুলগুলি যেন সাদা রেশমের। তাতে প্রতিফলিত হয়েছে জ্যোৎস্না। টুলটুলে মুখখানি অপরূপ, বরফের মতো সাদা। তাতেও লেগেছে জ্যোৎস্নার স্পর্শ। চোখ দুটি কুচ-কুচে কালো। তাতে অসহায় দৃষ্টি। ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপছে।

"কে তুমি?"

"আমি চাঁদের বুড়ী।"

"বুড়ী? কিন্তু তোমাকে তো বুড়ো মনে হচ্ছে না!"

"তুমি তো ছেলেমানুষ!"

"সকলে কিন্তু আমাকে বুড়ী বলে ডাকে। তোমার ঠাকুমার ঠাকুমা, তার ঠাকুমা, আদ্যিকাল থেকে যত ঠাকুমা হয়েছে সবাই আমাকে বুড়ী বলে। আমার বয়স কিন্তু বাড়ে নি। আমি তোমারই বয়সী।"

"এখানে কেন এলে?"

"চাঁদ থেকে পালিয়ে এসেছি।"

"পালিয়ে এসেছ! কেন?"

"ভয়ে। ওরা চাঁদে যন্তর নামিয়েছে। তোমার এই ঘরটিতে আমাকে আশ্রয় দেবে? তোমার এই যাদুঘরেই আমি সুখে থাকব। দেবে আমাকে থাকতে?"

এর পরই খোকন দড়াম করে পড়ে গেল। শব্দ শুনে বারান্দা থেকে নেমে এল বিশু। তুলে আনল তাকে ঘরে। চোখ-মুখে জল দিতেই জ্ঞান ফিরে এল খোকনের।

“সে কোথা গেল—”

“কে?”

“সেই চাঁদের বুড়ী।”

“চাঁদের বুড়ী! মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি তোমার।”

“কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখলাম যে!”

“তুমি দেখেছ জ্যোৎস্না। আজ বিকেলে বাঁদর লাফিয়ে ও-ঘরের একটা টালি ফেলে দিয়েছে। ফাঁকা দিয়ে জ্যোৎস্না ঢুকেছে ঘরে।”

খোকন আবার গিয়ে দেখল। ঘরে কেউ নেই। টালির ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে খালি।

খোকন ঠিক করেছে সে বিজ্ঞান পড়বে। বিজ্ঞান পড়ে গবেষণা করবে। সে প্রমাণ করবে যে, চাঁদের বুড়ী মিথ্যে কল্পনা নয়। সে পড়েছে চাঁদে বরফ আছে। তুষার-মানবের কথাও শুনেছে। তাহলে তুষার-মানবী, তুষার-কিশোরীই বা থাকবে না কেন? এ নিয়ে গবেষণা করবে সে।

মুশকিল হয়েছে তার অসুখটা নিয়ে। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে বিছানা ছেড়ে উঠে চলে যায় সে। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছেন সেরে যাবে।

এখনও মাঝে মাঝে চাঁদের বুড়ীকে স্বপ্নে দেখে সে।

একদিন এসে বলেছিলো—“আমি তোমার যাদুঘরেই আছি এখনও। কোথাও যাইনি।”

তার কালো সরল চোখ দুটি হাসছিল।

সেদিন ভোরে

খোকনের সেদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

এত ভোরে যে, তখনও কেউ জাগেনি—ঠাকুমা পর্যন্ত না।

জানলা দিয়ে খোকনের প্রথমেই চোখে পড়ল বকুল গাছের আড়ালে চাঁদ অস্ত যাচ্ছে, আর চাঁদের ঠিক পাশেই দৈত্যের মত প্রকাণ্ড একখানা কালো মেঘ বিশাল হাঁ করে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে চাঁদের দিকে।

চাঁদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

তার মুখের হাসি এতটুকু কমেনি। কাছে শুকতারাটিও জ্বল্-জ্বল্ করে জ্বলছে। তার এতটুকু ভয় নেই।

খোকন বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। আস্তে আস্তে দরজাটি খুলে বাগানে এসে দাঁড়াল। কি সুন্দর ভোরের আধ-ফোটা আলো! চতুর্দিকে যেন স্বপ্ন দেখছে।

"নমস্কার!"

খোকন ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে। কেউ ত নেই! তবে নমস্কার করলে কে?

"নমস্কার—"

এ ত অদ্ভুত ব্যাপার—কোথাও কেউ নেই—অথচ—"নমস্কার—"

হঠাৎ খোকন দেখতে পেলে বাগানের বেড়ার গায়ে একটি অপরাজিতা ফুল ফুটেছে—আর তার ভেতর থেকে একটি সুন্দর ছোট্ট মুখ তার দিকে চেয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে।

"নমস্কার—"

প্রতি-নমস্কার করে খোকনও এগিয়ে গেল। এরকম আশ্চর্য ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা সে কখনও ভাবেও নি!

ফুলের ভেতর মানুষ থাকে নাকি!

ছোট্ট সুন্দর মুখখানি ত!

একটু ঝুঁকে খোকন অবাক্ হয়ে দেখতে লাগল।

ফুলের ভেতর থেকে হাসি শোনা যাচ্ছে—কি মিষ্টি হাসি!

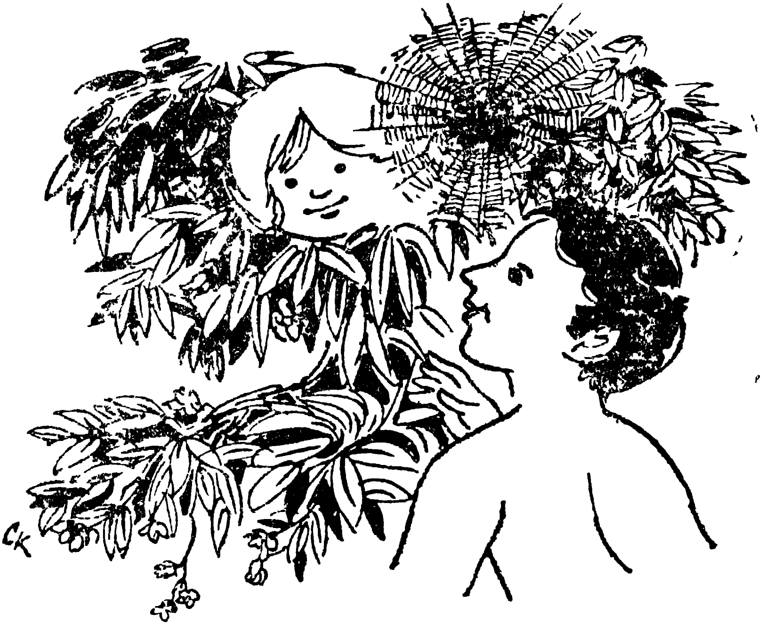

একটি সুন্দর ছোট্ট মুখ তার দিক চেয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে।

ছোট্ট মুখখানি হাসিতে ভরে গেছে।

খোকন একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে—"আমাকে ডাকছিলেন?"

"হ্যাঁ—"

বলেই আবার হাসি।

খোকন জিজ্ঞেস করলে—"আপনি অত হাসছেন কেন?"

"আমি?"

আবার মুখখানি হাসিতে ভরে গেল।

খোকনের এবার একটু রাগ হল। কথাবার্তা নেই—খালি হাসি!

"অত হাসছেন কেন শুধু শুধু?"

"তোমাকে দেখে! কি প্রকাণ্ড বড় তুমি! মাথার চুলগুলোও তোমার কি অদ্ভুত! সামনের দিকটা লম্বা—পেছনে মোটে নেই। ওটা পরেছো কি তুমি?"

"এটা জাঙিয়া—"

"জাঙিয়া!"

হেসে লুটিয়ে পড়ল সে।

তার হাসির ধমকে অপরাজিতা ফুলটা পর্যন্ত দুলতে লাগল।

খোকা ত অবাক্!

অমন সুন্দর করে তার চুল ছেঁটে দিয়েছে হীরু নাপিত—অমন চমৎকার জাঙিয়া করে দিয়েছেন মাসিমা নিজের হাতে—আর তাই দেখে হাস্‌ছে এ! পাগল নাকি? খোকন প্রথমটায় ভদ্রতা করে 'আপনি' বলে কথা শুরু করেছিল—কিন্তু এখন বুঝতে পারলে খাতির করবার মত লোক নয় এ।

খোকন জিজ্ঞেস করলে,—"তোমার নাম কি?"

"নাম? নাম মানে কি?"

"নাম নেই তোমার? তুমি ছেলে, না মেয়ে?"

"জানি না ত!"

"কোথা থাক তুমি?"

"এই ফুলের ভিতর।"

এই অদ্ভুত লোককে আর কি প্রশ্ন করা চলতে পারে—খোকন ভাবতে লাগল। এরকম সে দেখেওনি—ভাবেওনি।

একটু ভেবে খোকন জিজ্ঞেস করলে—"জাতিয়া পর না বুঝি তোমরা? কি পর তাহলে?"

এই শুনে তার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল।

উত্তর না দিয়ে সে শুধু হাসতে লাগল।

খোকন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

খোকন ভাবতে লাগল—একে আর কি বলা চলে। কিছু বললেই ও খালি হাসতে থাকবে।

এমন সময় ঘটল এক কাণ্ড!

শূন্য থেকে সুতো বেয়ে একটা মাকড়শা তরতর করে নেমে এসে পড়ল অপরাজিতা ফুলটার ওপর!

"ওগো—মা—গো—"

ছোট্ট মুখখানি ফুলের ভেতর পুটু করে ঢুকে গেল।

খোকন ভাবতে লাগল—"ওর মা আছে নাকি?"

"টিট্টু হড়মড়, টিট্টু খড়মড়—"

কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না ত।

খোকন বললে—"তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না। এ কোন্ দেশী ভাষা?"

বড় বড় চোখ বার করে মাকড়শা বললে:

"ও, তুমি বাংলা ছাড়া আর কিছু বোঝ না বুঝি। আমি যা বলছি এ তালগাছি ভাষা। আমি ট্রেনিং নেবার জন্যে আকাশমুখী তালগাছের ডগায় ছ'মাস ছিলাম কিনা!"

"সে আবার কোথায়?"

"ও, তা জানো না বুঝি! অপ্সরী নদীর ধারে প্রকাণ্ড এক মাঠ আছে। সেই মাঠের ঠিক মধ্যিখানে আকাশমুখী তালগাছ একা দাঁড়িয়ে আছে। শিকারী চিলের সেখানে বাসা। সেইখানে আমরা

ট্রেনিং নিতে যাই। সেই তালগাছি ভাষা বলছি। কি সুন্দর ভাষা সেখানকার—”

“টিট্টু খট্‌মট্‌ মড়্‌মড় টিট্টু, খন্‌খট্‌ ঝন্‌ঝন্‌ হড়মড় টিট্টু—”

খোকন তাড়াতাড়ি বললে—“চুপ কর তুমি—আর শুনতে চাই না। ওর মানে কি ?”

“মানে ?”

মাকড়শার ড্যাবডেবে চোখ দুটো মিট্‌ মিট্‌ করতে লাগল। তারপর হেসে বল্লে—“ওর মানে—

মাছি কই মাছি কই পোকা কই পোকা কই
দিন রাত জাল পেতে পথ পানে চেয়ে রই—

আমি কবিতা লিখতে পারি, জালও বুনতে পারি। কেমন সুন্দর জাল বুনেছি দেখেছো ? ওই দেখ।”

এই বলে সে ওপর দিকে চাইলে।

খোকন দেখলে জবা ফুলের গাছটার দুটো ডালের ফাঁকে সুন্দর একখানি মাকড়শার জাল। তাতে বিন্দু বিন্দু শিশির পড়েছে। মনে হচ্ছে সূক্ষ্ম রেশমের জালে কে যেন মুক্তো আর জরির কাজ করে দিয়েছে। এমন চমৎকার !

“কিন্তু কিছু হয় না—”

খোকন জিজ্ঞেস করলে “কি হয় না ?”

“একটা মাছি বা পোকা আজ পর্যন্ত ধরতে পারিনি। জায়গা বদলাব ভাবছি।”

“ফ্যাঁস্—ফোঁস্, খবরদার—”

খোকন চমকে উঠল।

মাকড়শাও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান !

খোকন দেখলে, একটা কালো বেড়াল লোম ফুলিয়ে পিঠটাকে

বাঁকিয়ে ধনুকের মত করে হাসনাহানার ঝোপটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

হাসনাহানা ঝোপের তল থেকে একটা প্রকাণ্ড বহুরূপী গিরগিটি গলা ফুলিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলছে—"চোপ রও—"

বেড়াল বললে, "জানিস্, আমি বাঘের মাসী—"

গিরগিটি সগর্বে ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে—

"তোর বাঘের আমি থোড়াই কেয়ার করি—কুমীর আমার মামা—"

"খবরদার!"

"চোপ রও।"

খোকন দেখলে নির্ঘাৎ এইবার ভীষণ দাঙ্গা হবে একটা। সে একটা ছোট ইঁট তুলে নিলে।

ইঁট তুলতেই বেড়ালটা ল্যাজ তুলে পালালো।

গিরগিটিও হাসনাহানার ঝোপে সুট করে ঢুকে পড়ল।

টুম্ টুমা টুম্ টুম্
একি রাগের ধুম।
ইঁট ফেলে দাও খোকনমণি
ইঁট ফেলে দাও চাঁদ সোনা—
ও ইঁট গায়ে লাগলে পরে
বাঁচবো নারে বাঁচবো না ;
ছোট্ট আমি টুনটুনি।

খোকন দেখলে ছোট্ট একটা টুনটুনি পাখি হাসনাহানার ডালে নাচছে আর গাইছে।

আজ এসব হচ্ছে কি!

হঠাৎ টুনটুনি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল।

টুনটুনির কথামত খোকনও ইঁটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

খোকনের গায়ে জোর ত কম নয়!

ইঁটটা কদমগাছটা ভেদ করে বোঁ করে পাঁচিল টপ্‌কে চলে গেল।

"কুহু, কুহু,—কুহু-কুহু"

কোকিল ডাকছে।

খোকনের মনে হতে লাগল যেন বলছে—"উহু,-উহু,-উহু,-উহু।"

ইঁটটা লাগল নাকি কোকিলটার?

কড়-কড়-কড়-কড়াৎ—

মেঘ ডেকে উঠল।

খোকন চেয়ে দেখলে সেই দৈত্যের মতন মেঘটা সমস্ত আকাশ দখল করে হুঙ্কার ছাড়ছে।

চতুর্দিক কালোয় কালো।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে!

চাঁদ নেই—শুকতারাও নেই।

"আচ্ছা খোকন, এই ভোরে খালি গায়ে শিশিরে শিশিরে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন? অসুখ করবে যে! বৃষ্টি আসছে। ভেতরে যা। বিড়বিড় করে আপন মনে কি বকছিস তুই একা?"

ঠাকুমা বাগানে পুজোর ফুল তুলে বেড়াচ্ছেন।

খোকন চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

সত্যি, কোথায় এতক্ষণ ছিল সে?

যেন অন্য রাজ্যে!

ঠাকুমা ডাকতেই সব যেন মিলিয়ে গেল।

সে তাড়াতাড়ি বেড়ার কাছে গিয়ে দেখলে অপরাজিতা ফুলটি নেই! "ঠাকুমা, এইখানে যে ফুলটি ছিল—কি হ'ল?"

"এই যে, পুজোর জন্যে তুলেছি।"

খোকন একদৃষ্টে ছিন্ন অপরাজিতাটার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার কেমন যেন কান্না পেতে লাগল।

দুই খেয়া

এক

দুই বন্ধু যখন নদীতীরে এসে দাঁড়াল তখন খেয়ার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। খেয়া চলে গেছে অনেকক্ষণ। বিমূঢ়ের মতো চেয়ে রইল তারা নদীর দিকে। পার হতেই হবে যেমন করে হোক, কালই যে শেষ দিন। অনেক কষ্টে সুপারিশ জোগাড় করে মেডিকেল কলেজে ঢোকবার অনুমতি পেয়েছে তারা। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন কালই ভর্তি হবার শেষ দিন। কাল যদি তারা পৌঁছুতে না পারে তাদের জায়গায় অপর ছেলে নেওয়া হবে। উমেশ-নবীন দু'জনেরই বাড়ি পাড়াগাঁয়ে। রেল লাইন থেকে বেশ দূরে। কয়েক ক্রোশ হেঁটে নদী পার হয়ে তবে ট্রেনে চড়তে হয়। বাড়িতে টাকার জোগাড় করতে এসেছিল তারা। অতগুলো টাকা চট করে জোগাড় হয়ে ওঠেনি। দেরি হ'য়ে গেছে। খেয়ার নৌকো চলে গেছে অনেকক্ষণ। নদীর দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা। সামান্য একটা নৌকোর অভাবে মেডিকেল কলেজে ঢোকবার আশা বিসর্জন দিতে হবে?

উমেশ। সাঁতার জানিস তুই?

নবীন। না।

উমেশ। আমিও জানি না, মহা মুশকিল হল তো।

উমেশের পরিধানে খাকি হাফ প্যাণ্ট হাফ শার্ট। তার দূর সম্পর্কের এক দাদার কাছ থেকে ধার ক'রে এনেছে। নবীনের ধুতি পাঞ্জাবি পরা, সাধারণ বাঙালী-পোশাক। উমেশের চেয়েও নবীন বেশি গরীব। সাহেবী পোশাক ধার দেবার মতো দাদাও নেই।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজন। কাল সকালের আগে খেয়ার নৌকো নেই। সে-নৌকোয় গেলে ট্রেন ধরা যাবে না। নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছিল একটা বটগাছ কিছুদূরে। তার দিকে চেয়ে উমেশের ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে গেল হঠাৎ। আশায় আনন্দে চোখের দৃষ্টি ঝলমল ক'রে উঠল।

উমেশ। ওই গাছটার নীচে একটা ডিঙি বাঁধা আছেরে।

নবীন। হ্যাঁ, আছে তো, কার ডিঙি?

উমেশ। চল্ খোঁজ করা যাক।

এগিয়ে গেল দু'জনেই। মাঝি বললে, কোন এক দারোগা সাহেবের জন্য পাঠিয়েছেন ওপারের এক জমিদার। উমেশ বুদ্ধিমান ছেলে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়।

উমেশ। চিনিস তুই সে দারোগা সাহেবকে?

মাঝি। না হুজুর।

উমেশ। আমিই সেই দারোগা সাহেব। চল্।

তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে নৌকোয় উঠে বসল উমেশ। নবীন কিন্তু উঠল না, দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে।

উমেশ। আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

নবীন। না, আমি যাব না।

উমেশ। কেন?

নবীন। আমি তো দারোগা সাহেব নই।

উমেশ। দারোগা সাহেবের সঙ্গী তো বটে, আয়।

নবীন। না, আমি যাব না।

উমেশ। কি মুশকিল, আয় না!

নবীন। না।

উমেশের ভয় হচ্ছিল বেশি দেরি করলে আসল দারোগা না এসে পড়ে। সব ভেস্তে যাবে তা হলে। আরও দু-চার বার অনুরোধ

ক'রে উমেশ একাই শেষে চ'লে গেল। নবীনের গোয়ার্তুমির জন্যে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'রতে পারে না সে। নৌকো যখন মাঝ নদীতে

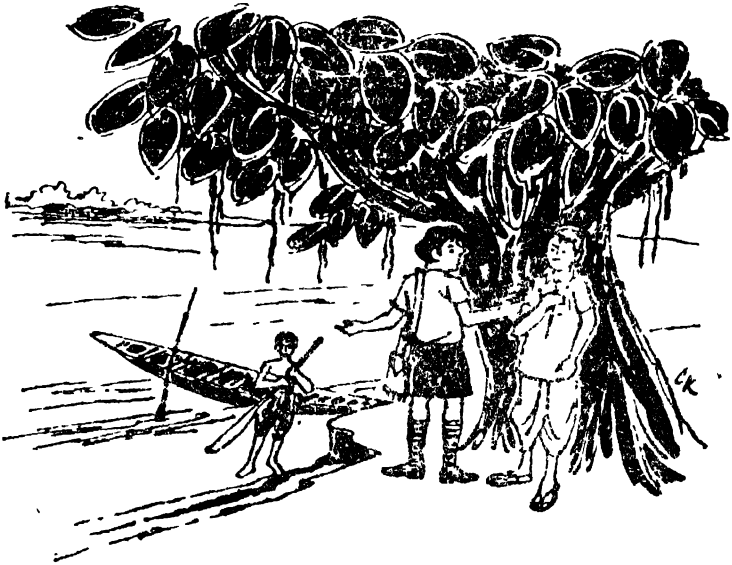

—আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

তখন একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল—অচল প্রস্তরমূর্তিবৎ নবীন তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

দুই

পঁচিশ বছর কেটে গেছে।

সেই নদীতীরে এক অন্ধকার রাত্রে আবার এসে দাঁড়াল উমেশ। এখন আর সে সে-উমেশ নেই। এখন সে মেজর ইউ. সি. চ্যাণ্ডা। পরিধানে খাকি মিলিটারি পোশাক। বাড়ি থেকে জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটি নিয়ে এসেছে সে। একমাত্র ছেলে টাইফয়েডে মুমূর্ষু। সেদিনও পারের খেয়া ছেড়ে চলে গেছে। টর্চ ফেলে ফেলে সেদিনও

সে হঠাৎ দেখতে পেলে একটা ছোট নৌকা একধারে বাঁধা রয়েছে। এগিয়ে গেল।

"এই—কার নৌকা?"

একটি জীর্ণ-শীর্ণ গোছের লোক ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

"আমার নৌকা—"

পার করে দিবি?"

"না।"

শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলে লোকটি। কিছুক্ষণ আগেই তাদের গ্রামে মিলিটারি 'রেড' হয়ে গেছে। খাকি পোশাক দেখলেই সমস্ত মন কণ্টকিত হয়ে ওঠে তার। ভয়ে নয়, ঘৃণায়। ভয় আর আর নেই। অতিব্যথা নির্ব্যথা ক'রে দিয়েছে মনকে।

"যাবি না কেন?"

"আমার অন্য কাজ আছে।"

"ভাড়া দেব, যা ভাড়া চাস দেব।"

"না, আমি যেতে পারব না।"

পাঁচ-দশ-বিশ-পঞ্চাশ-একশ টাকা পর্যন্ত দিতে চাইলে উমেশ। লোকটা অবিচলিত। কিছুতেই যাবে না সে। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল উমেশের।

"আমি মিলিটারির লোক জানিস?"

লোকটা নিরুত্তর।

"ইচ্ছে করলে তোকে জোর করে ধ'রে নিয়ে যেতে পারি জানিস?"

শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে লোকটা উত্তর দিলে—"আমি কিছুতেই যাব না।"

"দেখি তুই কেমন না যাস!"

উমেশ ঠিক করে ফেললে থানায় গিয়ে স্বয়ং দারোগাকে নিয়ে এসে এই ত্যাঁদড় লোকটাকে যেতে বাধ্য করবে সে। থানার দারোগাও মেজর ইউ. সি. চ্যাণ্ডার অনুরোধ অগ্রাহ্য করবে না নিশ্চয়। থানা কিন্তু নদীর ঘাট থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। তা হোক তবু যাবে সে। অন্য উপায়ও তো নেই। গট গট ক'রে অন্ধকারে এগিয়ে গেল সে থানার দিকে।

……একটু পরে অন্ধকারে নদীতীরে আর একজন এসে দাঁড়াল। খালি পা, পরনে হাঁটু পর্যন্ত গুটানো খদ্দরের কাপড়, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। নবীন, তাকেও ওপারে যেতে হবে। কিন্তু খেয়া চলে গেছে, ছোট নৌকোর মাঝিটি যেন তারই অপেক্ষা করছিল।

"দাদাঠাকুর, এলে নাকি?"

নবীন এগিয়ে এল।

"কে, আরে বিশু যে হঠাৎ এখানে—"

"আমি এ পারে মাছ ধরতে এসেছিলাম দাদাঠাকুর। মধুর কাছে শুনেছিলাম তুমি ওপারে গেছ সালিসির বৈঠকে। আমার সামনে খেয়ার নৌকোটা গেল বেরিয়ে। ভাবলুম, একটু অপিক্ষে করে যাই, দাদাঠাকুর যদি এসে পড়েন, ফাঁপরে পড়ে যাবেন এই রাত্তিরে—"

"তা বেশ করেছিস, চল্—"

"জান দাদাঠাকুর, এই একটু আগে এক ব্যাটা মিলিটারি এসে তম্বি শুরু করেছিল—"

গল্পটা বলতে বলতে নৌকো ছেড়ে দিলে সে।

নবীন ডাক্তার হতে পারেনি।

হয়েছিল দেশ-সেবক।

স্বপ্ন-কাহিনী

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা স্বপ্ন দেখিলাম। অদ্ভুত স্বপ্ন।

আণবিক যুগের এক অদ্ভুত যানে চড়িয়া যেন আকাশ-যাত্রা করিয়াছি। কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে না। মনে হইতেছে যেন নিজের বৈঠকখানায় সোফায় বসিয়া আছি। বিজ্ঞানের সহায়তায় বাংলা দেশের আবহাওয়াকেই যেন আমার চতুর্দিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি। পাশে বাতায়নটি খোলা আছে। নানাবিধ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। দেখিতে দেখিতে পৃথিবী ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। ঊর্ধ্বে, নিম্নে, দক্ষিণে, বামে, নানা আকৃতির নানা বর্ণের মেঘ ভাসিতেছে। ক্রমশঃ মেঘলোকও ছাড়াইয়া গেলাম। তাহার পর একটু অন্ধকার, একটু পরে সহসা আবার সর্বাঙ্গ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেল। চন্দ্রলোকের কাছাকাছি আসিয়াছি। যে চন্দ্রকে দূর হইতে ছোট একটা থালার ন্যায় দেখিতাম সহসা তাহার বিরাট মূর্তি দেখিতে পাইলাম। সমস্ত দৃষ্টিমণ্ডল আবৃত করিয়া তুষারাবৃত প্রকাণ্ড একটা গোলক আবর্তিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে চন্দ্রলোকও পার হইয়া গেলাম। তাহার পর আবার অন্ধকার। কিছুক্ষণ পরে বাতায়ন দিয়া দেখিলাম অতি দ্রুত বেগে আমরা আর এক জ্যোতির্ময় লোকের সমীপবর্তী হইতেছি।

চালক বলিলেন, “নীচের দিকে দেখুন!” দেখিলাম সবুজাভ গোলকের ন্যায় কি যেন একটা আকাশপটে শোভা পাইতেছে। এমন শ্যামোজ্জ্বল বর্ণ ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই।

“কি ওটা?” প্রশ্ন করিলাম।

চালক বলিলেন, “আমাদের পৃথিবী। আরও খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকুন, আর একটা জিনিস দেখিতে পাইবেন।”

চাহিয়া রহিলাম. দেখিলাম জ্যোতির্ময় লোক হইতে মাঝে মাঝে এক একটা কিরণ-রেখা আসিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছে। স্পর্শ করিবামাত্র সেই শ্যামগ্রহের অঙ্গে যেন শিহরণ জাগিতেছে, তাহার শ্যামদ্যুতি প্রতিস্পর্শে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে।

পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—"ব্যাপার কি, কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না।"

চালক বলিলেন, "আমরা ঐ যে জ্যোতির্ময় লোকের নিকটবর্তী হইয়াছি তাহার নাম সম্ভবলোক, যে কিরণ-রেখা আসিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছে তাহার নাম জন্মধারা, ওই আলোকধারা বাহিয়া অসংখ্য জড় ও জীবের সম্ভাবনা পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। কালক্রমে তাহারা সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে মূর্ত হইবে।

"আমরা কি সম্ভবলোকেই যাইতেছি ?"

"না, আমরা চলিয়াছি মহাকালের উদ্দেশে।"

শুনিয়া একটু ভীত হইলাম।

মহাকাল তো ধ্বংসের দেবতা, আমরা কি ধ্বংসের অভিমুখে চলিয়াছি ?"

"ধ্বংসই তো নবজীবনের ভূমিকা। ভয় পাইতেছেন কেন ?"

"সম্ভবলোকটা একটু দেখিয়া গেলে হয় না ?"

সানুনয়ে অনুরোধ করিলাম।

"বেশ, আপনার কৌতূহল থাকে, চলুন। আমার কৌতূহল নাই। আমি তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিলেই বাঁচি !"

চালক সুইচ টিপিলেন। আমাদের যান সম্ভবলোক অভিমুখে দ্রুততর বেগে ছুটিতে লাগিল।

"ওই দেখুন—"

দূর হইতে যাহাকে সূক্ষ্ম কিরণ-রেখা মনে হইতেছিল তাহারই বিস্তৃততর রূপ দেখিতে পাইলাম। একটা আলোকের প্রপাত

নিঃশব্দে অবতরণ করিতেছে এবং সেই আলোক-নির্ঝরে ক্ষুদ্রায়িত রূপে নিখিল বিশ্বের সবকিছুই যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে নামিতেছে, ভবিষ্যৎ-হিমালয়-ভ্রমণকে বল্মীক-স্তূপের আকারে দেখিলাম ; বিরাট বিরাট জীবজন্তু, ওষধি বনস্পতি যেন ছোট ছোট পুতুলের মতো, সম্পূর্ণ অথচ ক্ষুদ্র, মানুষের চিহ্ন কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ কোটি কোটি আরও কি যেন সব ভাসিয়া চলিয়াছে, উহারাই হয় তো মানুষ।

দেখিতে দেখিতে সেই আলোর প্রপাতকে দূরে রাখিয়া আমরা আরও অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সম্ভবলোক।

অবতরণোন্মুখ আর একটি আলোক-প্রপাত বিরাট নিস্তরঙ্গ তরঙ্গিণীবৎ দিগন্তবিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। তাহার দুই তীরে শুভ্র কুজ্ঝটিকার প্রাকার। অসংখ্য কাশফুল যেন আকাশ পর্যন্ত স্তূপীকৃত রহিয়াছে। মনে হইতেছে পুঞ্জীভূত হইয়া কিসের যেন প্রতীক্ষা করিতেছে, এক অত্যুজ্জ্বল আলোক-পরিমণ্ডলী সমস্ত জ্যোতির্ময়-লোককে বেষ্টন করিয়া যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। সেই বিশাল পরিমণ্ডলীর একপ্রান্তে আমাদের যান ক্ষুদ্র একটি পতঙ্গের ন্যায় মহাশূন্যে স্থির হইয়া আছে। আমার দৃষ্টিও স্বপ্নাতুর। রূপকথা-লোকের রূপসাগরে সমস্ত মন যেন ডুবিয়া গিয়াছে। অবতরণোন্মুখ আলোক-প্রপাতের আরও নিকটবর্তী হওয়াতে অতি ক্ষুদ্র মানব-শিশুদের এবার দেখিতে পাইতেছি। অসংখ্য পশু-পক্ষী, হস্তী-ব্যাঘ্র, অরণ্য-পর্বত, জনপদ-মহাদেশ আরও স্পষ্টভাবে নয়নগোচর হইতেছে। সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া মানব-শিশুদের আনন্দ কলরব মর্মরধ্বনির মতো শুনিতে পাইতেছি। আলোক-প্রপাত তখনও গতিহীন, তখনও তাহার অবতরণ আরম্ভ হয় নাই। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছি, কখন কি ঘটে।

সহসা মহাশূন্য যেন কথা কহিয়া উঠিল। গম্ভীর মধুর কণ্ঠে কে যেন কহিল—"সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তোমার এবার সময় হইয়াছে, তোমাকে এইবার মর্ত্যলোকে অবতরণ করিতে হইবে। তোমার জীবনব্যাপী সাধনায় পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তোমার অকৃত্রিম দেশপ্রেমে প্রীত হইয়া তিনি তোমার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন।

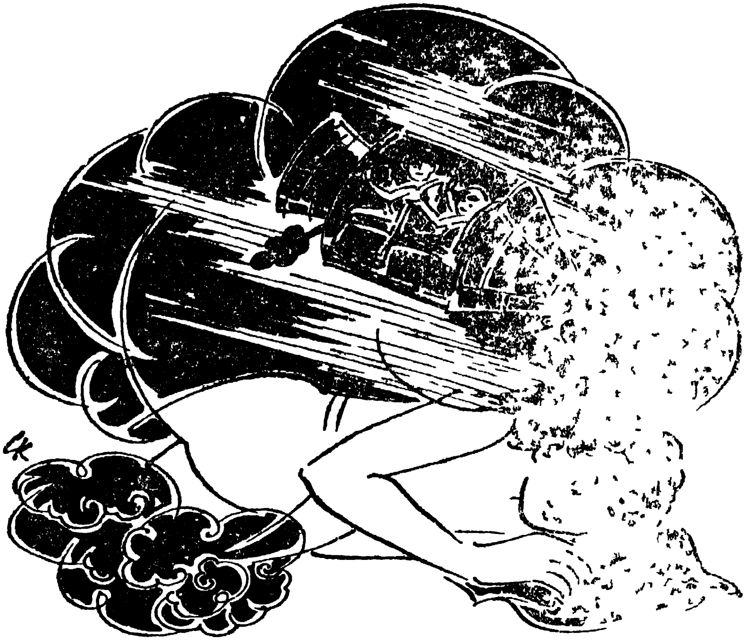

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

তোমার সাধ ছিল—যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, বাংলাদেশেই আবার যেন ফিরিয়া আসি। আদিজনক চতুরানন তোমার সে সাধ পূর্ণ করিবেন। তুমি যে রূপে যে গৃহে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিতে চাও, বল, সেইরূপে সেই গৃহেই তোমাকে প্রেরণ করা হইবে।

তোমার কর্মফলে প্রীত হইয়া ভগবান ব্রহ্মা এ স্বাধীনতাটুকুও দিয়াছেন। তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।”

শুধু কুজ্ঝটিকা-জাল ভেদ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের, আমাদের সেই অতি পরিচিত সুরেন্দ্রনাথের সৌম্য জ্যোতির্ময় মূর্তি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া স্পষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠে তিনি বলিলেন, “আমি আর বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিতে চাহি না।” আকাশবাণী পুনরায় ধ্বনিত হইল—“তুমি না চাহিলেও তোমাকে বঙ্গদেশেই যাইতে হইবে। পিতামহের বিধান অমোঘ, তোমাকে কেবল এই স্বাধীনতাটুকু দেওয়া হইয়াছে, তুমি যে রূপে যেখানে যাইতে চাইবে সেই রূপেই তোমাকে সেখানে পাঠানো হইবে। অভিমত ব্যক্ত করিতে বিলম্ব করিও না, জ্যোতির্ময়ী জন্মধারা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কি রূপে সেখানে যাইতে চাও, বল।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন—“পাথর।”

চালক সুইচ টিপিলেন।

আমাদের যান আবার দ্রুতবেগে মহাকালের উদ্দেশে ছুটিতে লাগিল।

পরীরা সব পারে

খোকনের একটা অদ্ভুত শক্তি আছে। আমরা সাধারণতঃ সাদা চোখে যা দেখি খোকন তার বাইরেও অন্যরকম কিছু একটা দেখতে পায়। খুব ছেলেবেলায় সে একবার কতকগুলো ফুল দেখিয়ে তার পিসিমাকে জিগ্যেস করেছিল, "পিসি, ওগুলো কি বল তো?"

"ওগুলো তো 'প্যানসি' ফুল।"

খোকন হেসে বলেছিল, "ওরা প্যানসি ফুল সেজে বসে আছে। আসলে ওগুলো প্রজাপতি। পাছে পাখিরা ওদের খেয়ে ফেলে তাই 'প্যানসি' সেজে বসে আছে ওরা।"

এখন খোকনের বয়স দশ বছর। এখনও ও নানারকম অদ্ভুত জিনিস দেখতে পায়। শুধু দেখতে পায় নয়, সেগুলো যে সত্যি তা-ও বিশ্বাস করে।

কিছুদিন আগে এক পরী নিয়ে তার মানসিক জগতে একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। এখন তার স্থির বিশ্বাস পরীরা সব পারে।

পরীটিকে সে আবিষ্কার করেছিল তার পড়ার ঘরের দেওয়ালে। সে যে ঘরটিতে যে টেবিলে বসে পড়ে তার সামনের দেওয়ালটা চুনকাম করা। সেই চুনকামের ভিতর হঠাৎ সে একদিন দেখতে পেল পরীটিকে। তোমার আমার চোখে ওটা হয়তো চুনের পোঁচড়ার দাগ বলে মনে হত, কিন্তু খোকনের তা হল না। সে যেন দেখতে পেল একটি পরী উড়ে চলেছে, উড়ছে তার চুলের রাশি, উড়ছে ওড়না, হাত দুটো আকাশের দিকে তোলা, মুখটাও আকাশমুখী। আকাশের দিকেই যেন উড়ে চলেছে। রোজই দেখত তাকে। যত দেখত ততই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠত সেটা তার চোখে। ক্রমশঃ তার চোখ, নাক, চিবুক কিছুই আর অস্পষ্ট রইল না। পরিপূর্ণ পরীটি ধরা দিল

তার চোখে। কাউকে কিন্তু এ-কথা বলেনি সে। আগের অভিজ্ঞতা থেকে সে জানত তার এসব কথা বিশ্বাস করবে না কেউ, হাসাহাসি আর ঠাট্টা করবে কেবল। তাই সে গোপন রেখেছিল তার এই আবিষ্কারটা। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখত পরীটির দিকে। কতবার যে দেখত তার ঠিক নেই। হঠাৎ একদিন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সে। দেখল পরীটির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে। তার ডানায়, তার ওড়নায় একটা মৃদু শিহরণ জাগছে যেন। নির্বাক্ হয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সে পরীটির দিকে।

তারপর মুচকি হেসে বলল—"ওখানে রয়েছ কেন? ওখান থেকে নেমে এসে ঐ চেয়ারটায় বস না।"

পরী কোন উত্তর দেয় না।

তারপর একদিন লোভ দেখাল।

"লজেন্‌স্ খাবে? খুব ভাল লজেন্‌স্ আছে আমার কাছে—"

পরী উত্তর দিল না, কিন্তু খোকনের মনে হল তার মুখের মৃদু হাসিটা আর একটু স্পষ্ট হল যেন।

রোজই খোকন পরীর দিকে চেয়ে থাকে। রোজই মনে হয় ও জীবন্ত। এখনই বুঝি কথা কইবে। কিন্তু কয় না।

তারপর একদিন একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। খোকনের মনে হল তাব সর্বনাশ হয়ে গেছে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে খোকন মামার বাড়ি গিয়েছিল। মাস খানেক পরে ফিরে এসে দেখে দেওয়ালে পরী নেই। দেওয়াল নতুন করে চুনকাম করানো হয়েছে। পরী উড়ে গেছে।

পরীর অন্তর্ধানে কয়েক দিন খুব মনঃকষ্টে কাটল খোকনের। কিন্তু কিছুদিন পরে তার ধারণা হল দেওয়াল থেকে পরী যদিও উড়ে গেছে, কিন্তু কাছেপিঠে কোথাও আছে নিশ্চয়ই। হঠাৎ আবার কোথাও না কোথাও দেখতে পাবে তাকে একদিন। খোকন রাস্তায়

যখন বেরুত, এদিক ওদিক চাইতে চাইতে যেত, যদি হঠাৎ দেখা পেয়ে যায় তার।

একদিন পেয়ে গেল। আকাশের গায়ে। সাধারণ লোক মনে করত ওটা মেঘ। কিন্তু খোকন বুঝতে পারল ওটা মেঘ নয়, পরী, সেই পরীটাই। তেমনি চুল, ওড়না উড়ছে, হাত দুটো তেমনি, ওড়নার ফাঁকে তেমনি ডানা দুটো দেখা যাচ্ছে।

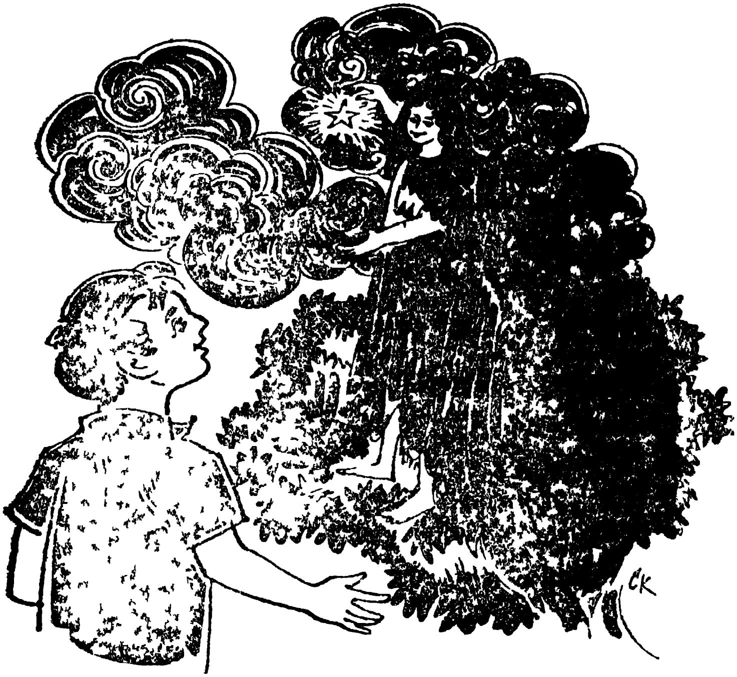

....ওটা মেঘ নয়, পরী, সেই পরীটাই

পরীরা সব পারে।

চোখ, নাক, মুখ, চিবুক—অবিকল সেই রকম। সেই মুচকি হাসিটিও রয়েছে। তবে একটু তফাৎ ছিল। সূর্যাস্ত হচ্ছিল তখন।

একটু গোলাপী আর বেগুনী রঙের আভা লেগেছিল তার মুখে-চোখে। পরীর সামনেই বিরাট একটা কালো মেঘ, যেন একটা পাহাড়, আর তার আশপাশের রঙিন মেঘগুলো যেন একটা বাগান। দেখতে দেখতে পরী সেই পাহাড়ের দিকে উড়ে গেল। হারিয়ে গেল রঙিন মেঘের বাগানে। নির্বাক্ হয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল খোকন। তার মনে হল পরী এবার নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে গেছে। ওখানে কোন মিস্ত্রী চুনকাম করতে যাবে না। কিন্তু আবার কবে দেখা পাবে ওর ? আকাশের ঠিক ওইখানটিতেই কি সে আবার আসবে ?

এরপর একদিন আর এক কাণ্ড হয়ে গেল।

খোকনের বাবা মুশকিলে পড়ে গেলেন। তাঁর আপিসের নতুন সাহেব এসেছেন। খুব কড়া মেজারের লোক। তিনি তার বাবাকে 'সাস্‌পেণ্ড' করে দিয়েছেন হঠাৎ। বাবা অনেক সময় আপিসের কাগজপত্র বাড়িতে নিয়ে এসে 'টাইপ' করতেন। একটা দরকারী কাগজ নাকি হারিয়ে গেছে। আগে যে সাহেব ছিলেন তাঁর হাতের লেখা একটা চিঠি। সে সাহেব সিঙ্গাপুরে বদলী হয়ে গেছেন। তাঁর কাছ থেকে আবার চিঠি লিখিয়ে আনা সহজ নয়। অথচ চিঠিটা পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। ক্ষিতীশবাবু—খোকনের বাবা—খুবই মুষড়ে পড়েছেন। এ বাজারে যদি চাকরিটি চলে যায় সংসার অচল হয়ে পড়বে। তিনি আপিসের বড়বাবুকে দিয়ে নতুন সাহেবকে বলিয়েছিলেন যদি তিনি অপরাধটা মাপ করে দেন। সাহেব বলেছেন চিঠিখানা ক্ষিতীশবাবু যদি খুঁজে বার করতে পারেন তাহলেই তাঁকে আবার আপিসের কাজে বাহাল করা হবে। কিন্তু ক্ষিতীশবাবু কিছুতেই চিঠিটা খুঁজে পাচ্ছেন না। মাঝে একদিন একটু ঝড়ের মতো হয়েছিল, সেই সময় হয়তো কোথাও উড়ে গেছে। রাস্তায়, ছাতে, এমনকি, ডাস্টবিনেও খোঁজা হল কিন্তু পাওয়া গেল

না চিঠিটা। একটা আসন্ন বিপদের অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রাখল সমস্ত পরিবারকে।

খোকনেরও কষ্ট হল খুব। তার কিন্তু মনে হতে লাগল পরীকে দেওয়াল থেকে চুনকাম করে পুঁছে ফেলার জন্যেই এ বিপদ হল। পরীর মনের কষ্টই বোধহয় প্রতিফলিত হয়েছে তাদের পরিবারে। পরী কোথায় আজকাল ? খোকন স্কুলে যাবার সময়, স্কুল থেকে আসবার সময় আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে, পরীর দেখা পায় না। একদিন দেখলে প্রকাণ্ড একটা কালো কুমিরের মতো মেঘ হাঁ করে রয়েছে সমস্ত আকাশ জুড়ে। দেখে শিউরে উঠল খোকন। ওই কুমির পরীকে খেয়ে ফেলেনি তো! আরও মন খারাপ হয়ে গেল তার। এর দু'দিন পরে সেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল। ছাত থেকে খোকন দেখতে পেল একটা ঘুড়ি কেটেছে। উড়ে উড়ে তাদেরই বাড়ির দিকে আসছে। তরতর করে নেবে গেল খোকন ছাত থেকে, যদি ঘুড়িটা পায়। তাদের বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে হাজির হল একটা বাঁশের লগি হাতে করে। গিয়ে কিন্তু ঘুড়িটাকে দেখতে পেল না। কোন্ দিকে উড়ে যেন চলে গেছে। সামনে একটা আমড়া গাছ দাঁড়িয়েছিল। তাকে ঘিরে উঠেছে বুনো একটা লতা। সেদিকে চেয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল খোকন। লতার ঝোপে ঐ তো পরী বসে আছে। মুখটাতে লাল আর বেগুনীর আভা, সেদিন আকাশে যেমন দেখেছিল। পিঠের দিকে সাদা ওড়নাটা উড়ছে। আর কিছু দেখা যায় না। বাকীটা সব লতার ঝোপে ঢাকা। "পরী, নেবে এস না"—আস্তে বলল খোকন। পরী কোনও উত্তর দেয় না। তখন বাঁশের লগিটা দিয়ে খোঁচা দিল সে একটু। আর সাদা ওড়ানাটা খুলে নীচে পড়ে গেল। সে তুলে দেখল টাইপ করা চিঠি একখানা। ছুটে গেল বাবার কাছে। বাবা উল্লসিত হয়ে উঠলেন। এই তো সেই হারানো চিঠি!

তিনি তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন আপিসে। ঘণ্টা দুই পরে ফিরে এসে বললেন, সাহেব খুশি হয়েছেন, চাকরিটা বেঁচে গেছে।

খোকনের ধারণা পরীই এ কাণ্ড করেছে। সেই ঘুড়ির ছদ্মবেশে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাড়ির পিছন দিকে। সেই মুখ বাড়িয়ে লতার ঝোপে বসেছিল চিঠিখানা নিয়ে। পরীরা সব পারে।

লাল বনাত

শত্রুপক্ষের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, রায়মহাশয় অদ্ভুত বেশে সজ্জিত হইয়া সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন। গায়ে টক্‌টকে লাল বনাতের কোট, মাথায় ধপধপে সাদা রেশমের পাগড়ি, অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত সাক্ষী কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সাক্ষী দিতেছেন। তিন বৎসর আত্মগোপন করিবার পর আজ এই প্রথম তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাতটি ফৌজদারি মকদ্দমায় তিনি আসামী, সাতটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তাঁহার নামে জারি হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি তিনি অধৃত। আজ এই প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার আবির্ভাবের গুরুতর হেতু আছে। স্বয়ং আসিয়া সাক্ষী না দিলে একটি প্রকাণ্ড মকদ্দমায় তিনি পরাজিত হইবেন, তাঁহার সম্পত্তির অর্ধেক বেহাত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে।

শত্রুপক্ষের লোকেরা পুলিশ-সমভিব্যাহারে আদালতের বারান্দায় আগ্রহে অপেক্ষমান, সাক্ষী দিয়া বাহির হইলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। ঠিক বারান্দার নীচেই একটি তেজস্বী অশ্ব গ্রীবা বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রতি মুহূর্তেই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। রায়মহাশয়ের ঘোড়া। পুলিশ সাহেবের ঘোড়াও অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

রায়মহাশয় সাক্ষী দিয়া বারান্দায় বাহির হইলেন এবং নিমেষের মধ্যে বারান্দার উপর হইতেই এক লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া গেল।

পুলিশ প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িল, তাহার পর একজন দারোগা পুলিশ সাহেবের ঘোড়াটা লইয়া আসামীর অনুসরণ করিলেন। রায়মহাশয় আগাইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই লাল বনাতের

কোট গায়ে, মাথায় সাদা পাগড়ি অশ্বারোহীকে দেখিতে পাওয়া গেল। অশ্ব তীরবেগে ছুটিতেছে।

দারোগাও ঘোড়ার গতিবেগ বাড়াইলেন। বন্ধুর মসৃণ ছোট-বড় বহুবিধ প্রান্তর পার হইয়া রায়মহাশয়ের অশ্ব অবশেষে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে দারোগার অশ্বও প্রবেশ করিল। বন অতিক্রম করিয়া আবার একটা মাঠ। মাঠে পড়িয়া দারোগা রায়মহাশয়কে পুনরায় দেখিতে পাইলেন—উদ্দাম বেগে ঘোড়া ছুটিতেছে। তিনিও ঘোড়াকে সজোরে কয়েকবার কশাঘাত করিলেন। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর দারোগার মনে হইল, বিধি প্রসন্ন হইয়াছেন। রায়মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি খুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা ঠিক করিবার জন্য তাঁহাকে নামিতে হইয়াছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দারোগা অকুস্থলে আসিয়া পৌঁছিলেন; রায়মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি তখনও ভাল করিয়া বাঁধা হয় নাই।

দারোগা ঘোড়া হইতে নামিয়া গ্রেপ্তার করিতে গিয়া কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। রায়মহাশয় নয়। দারোগার বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু দেখিয়া অপরিচিত লোকটা নীরবে দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া হাসিল।

বনের মধ্যে অশ্বারোহী বদল হইয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণব-শাক্ত

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি—অসম্ভব ভিড়।

তথাপি কিন্তু এক কোণে গাদাগাদি করিয়া বসিয়া পরমশাক্ত কালীকিঙ্কর বর্মা পরমবৈষ্ণব নিত্যানন্দ গোস্বামীর সহিত ধর্মবিষয়ক তর্ক করিতেছিলেন। বর্মার কৃষ্ণ বর্ণ, রক্ত চক্ষু, কপালে টক্‌টকে সিঁদুরের টিপ। গোস্বামীর গৌর বর্ণ, ধপধপে সাদা আবক্ষ গোঁফ-দাড়ি, চোখে নীল চশমা, খাঁড়ার মত নাকের উপর শ্বেত চন্দনের তিলক। মাথা দোলাইয়া গোস্বামী বলিলেন, যাই বলুন আপনি, ধর্মসাধনের প্রশস্ত পথই হ'ল প্রেমের পথ। রক্তারক্তি করাটা পৈশাচিক কাণ্ড। মানুষেও পারে না, পারা উচিতও না।

অট্টহাস্য করিয়া বর্মা বলিলেন, রক্তারক্তির আপনি বোঝেন কতটুকু, শুনি? পৈশাচিক কথাটা যে ব্যবহার করলেন, পিশাচ দেখেছেন কখনও। মুণ্ডমালিনী নরকালীর কোন ধারণা আছে আপনার?

দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, যতটুকু আছে তাই যথেষ্ট, মশাই! ওর বেশি ধারণা আমি করতেও চাই না। ছেলেবেলায় পাঁঠাকাটা দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম—

এমন সময় ঘচাং করিয়া ট্রেনটা থামিল। গোস্বামী মহাশয় টাল সামলাইতে না পারিয়া হুমড়ি খাইয়া বর্মা মহাশয়ের ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন।

বর্মার কপালের সিঁদুর গোস্বামীর নাকে লাগিল।

স্টেশনে শশা ফেরি করিতেছিল। বর্মা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া কিছু শশা কিনিলেন। একদল যাত্রী আসিয়া গাড়িতে

উঠিল। গাড়িতে নিতান্ত স্থানাভাব। সমাগত যাত্রিবৃন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যে যাত্রীটি দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার কাঁধে একটা প্রকাণ্ড মাদল ঝুলিতেছিল। ট্রেন ছাড়িলে গাড়ির ঝাঁকানির সঙ্গে সঙ্গে মাদলের একপ্রান্ত গোস্বামী মহাশয়ের নাসাগ্রে আন্দোলিত হইতে লাগিল। দুই একবার ঠোকাও লাগিল। মাদল খুব উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণবীয় বাদ্যযন্ত্র হইলেও নাসাগ্রে তাহা সুখকর নহে। গোস্বামী মহাশয় তাহা বুঝিয়া মৃদুকণ্ঠে মাদলধারীকে কহিলেন, একটু যদি স'রে দাঁড়াতে বাবা দয়া ক'রে—

কিন্তু দয়া করিতে সম্মত হইলেও লোকটির সরিবার উপায় ছিল না। নিরুপায় গোস্বামী তখন নিজের মাথাটাই যথাসম্ভব সরাইয়া মাদল আন্দোলন হইতে নিজের নাসা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

গোস্বামীর মাথার তির্যক ভাব দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বর্মা মহাশয় বলিলেন, তোমারা ব'সে পড় না হে! দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবে বাপু! যে যেখানে আছ ব'সে পড়।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাদলধারী বসিল।

নাসা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া গোস্বামী মহাশয় আবার শুরু করিলেন, এই যে মাদল—অপূর্ব জিনিস এ। বৈষ্ণবধর্মেরও অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে খোল আর খঞ্জনী। আপনার ধর্মে দেখান দিকি এমন জিনিস। আপনারা এক রক্তারক্তি ছাড়া—নাকের উপর ঠকাস করিয়া আঘাত দিয়া মাদলবাদক আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। গোস্বামী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে পারিল না। বর্মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আবার দাঁড়ালে কেন গো?

আজ্ঞে, পরের ইস্টিশনেই নামব।

সে তো এখনও দেরি আছে।

মাদলবাদক কিন্তু আর বসিল না। পরের স্টেশন পর্যন্ত গোস্বামী

মহাশয়ের নাকের সামনে মাদল সমানে আস্ফালন করিতে লাগিল।

পরের স্টেশন আসিল। গাড়ি ঘচাং করিয়া থামিতেই মাদলটা সজোরে গিয়া গোস্বামী-মহাশয়ের নাকে লাগিল। একটুর জন্য চশমাটা বাঁচিয়া গেল।

ট্রেন থামিলে হুড়মুড় করিয়া প্রায় সকলেই নামিয়া গেলেন। রহিলেন শুধু বর্মা আর গোস্বামী। বর্মা বলিলেন, এ-হে-হে-হে, নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল যে! মাদলের আঘাতে বৈষ্ণবের রক্তপাত! এ কি বিড়ম্বনা!

নাকটা মুছিয়া গোস্বামী বলিলেন, আসল জিনিস কি জানেন মশাই? অর্থ। পয়সা নেই বলেই না এই থার্ড ক্লাসে ভিড়ে চলেছি, তাই না এ দুর্দশা! অর্থ না থাকলে ধর্ম-টর্ম কিছু টেকে না।

অট্টহাস্য করিয়া শশা ছাড়াইতে ছাড়াইতে বর্মা মহাশয় বলিলেন, যা বলেছেন। অর্থ নেই ব'লেই না আমার মত শাক্তকে ছুরি দিয়ে শশা কেটে খেতে হচ্ছে! খাবেন নাকি শশা?

দিন। সবই অদৃষ্টের রহস্য!

সকলের চেয়ে বড় রহস্যটা কিন্তু উভয়েরই অজ্ঞাত রহিয়া গেল। পরের স্টেশনে যখন গোস্বামী মহাশয় শশা খাইয়া নামিয়া গেলেন তখন ছদ্মবেশী ডিটেকটিভ বর্মা মহাশয় জানিতেও পারিলেন না যে, গোস্বামীর অভিনয় করিয়া যিনি নামিয়া গেলেন তিনি দুর্ধর্ষ খুনী পলাতক বজ্রধর মিশ্র। অপর কেহ নন।

মাদলই ঠিক বুঝিয়াছিল।

কলার বিবর্তন

তখন সাহেবেরা এদেশে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন। সাধারণ লোকে সাহেবদের দেবতা বলিয়া মনে করিতেছে। যাহা কিছু ভালো তাহাই বিলাতী বিশেষণে ভূষিত হইতেছে। বিলাতী সভ্যতাই যে আমাদের দেশকে ত্রাণ করিবে এ বিশ্বাস শিক্ষিত সমাজেরও মনে শিকড় গাড়িয়াছে, অশিক্ষিত চাষাদের তো কথাই নাই। রেলগাড়ি দেখিয়াই তাহারা বুঝিয়াছে যে, বিলাতী দেবতারা অসাধ্য সাধন করিবে।

হারাধন সুদূর পল্লীগ্রামে থাকিত। রেলগাড়ি চড়িবার জন্যই সে একদিন গ্রাম হইতে পদব্রজে বাহির হইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, সঙ্গে কিছু পয়সা-কড়িও লইল। সে জানিত বিনা পয়সায় কিছু হয় না। এ গোরুর গাড়ি নয় যে গাড়োয়ানকে অনুরোধ করিলে কিছুদূর চড়াইয়া লইয়া যাইবে। বিলাতী কলের গাড়ি, টিকিট কাটিয়া চড়িতে হয়। তাছাড়া শহরে যাইতেছে কিছু ভালো বিলাতী জিনিস পাইলে কিনিয়া আনিবে। সুতরাং কিছু টাকা-পয়সাও সে সঙ্গে লইল।

অনেক দূর হাঁটিয়া বর্ধমান স্টেশনে সে আসিয়া প্রথম ট্রেনে চাপিল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়া গেল। অবাক্ কাণ্ড, মাত্র কয়েক ঘণ্টায় কলিকাতা। গোরুর গাড়িতে আসিলে কয়দিন লাগিত ঠিক কি!

কলিকাতার জনারণ্যে কিছুক্ষণ দিশাহারা হইয়া ঘুরিবার পর তাহার হুঁশ হইল যে, পথ হারাইয়া গিয়াছে। বাড়ি ফেরা যাইবে না। ব্যাকুল হইয়া আরও কিছুক্ষণ ঘুরিল, কিন্তু তাহাতে সুবিধা হইল না। অবশেষে হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল বেচারা।

"কি রে কাঁদছিস কেন, কে তুই ?"

"আমি হারাধন। পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

"কোথায় যাবি ?"

"হাওড়া।"

"চল্, আমিও হাওড়া যাব। গাছ ক'টা বেচে ফেলি। আয় আমার সঙ্গে।"

একটি গলির ভিতর দিয়া হারাধন একটা তরকারির বাজারে আসিয়া হাজির হইল। যে লোকটি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল সত্যই তাহার কয়েকটি গাছ ছিল একটা ঝুড়িতে। হারাধন যদিও চাষা তবু ওগুলা কি গাছ তাহা চিনিতে পারিল না।

জিজ্ঞাসা করিল, "কলা গাছের মতো পাতা, ওগুলো কি গাছ ?"

হারাধন যে কি জাতীয় খাজা তাহা কলিকাতাবাসী শ্যামচাঁদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সে মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল, "কলাগাছই। বিলিতি কলা—"

"বিলিতি কলা! আমিই তাহলে কিনে নিই। কত দাম ?"

"পাঁচটি আছে, পাঁচ টাকা পড়বে।"

"কিছু কম হবে ?"

হারাধন গোটা দশেক টাকা লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল। ওই টাকা কয়টা জমাইতে তাহার এক বৎসর লাগিয়াছিল। তখন পাচ টাকায় একটা ছোটখাটো গোরু পাওয়া যাইত। পাঁচটা কলার চারা পাচ টাকা দিয়া কিনিবে কি-না হারাধন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

"নিবি তো নিয়ে নে। আমিও ঝাড়া-হাত-পা হয়ে যাই, তোকে হাওড়ায় পৌঁছে দি। এরকম জিনিস সহজে কোথাও পাবি না। আদত বিলিতি কলা—"

হারাধন চারাগুলি কিনিয়া ফেলিল।

"খুব ভালো গোবরের সার দিতে হবে।"

"তা আমি খুব পারব।"

বাড়ি ফিরিয়া খুব যত্ন করিয়াই সে বিলাতি কলার চারাগুলি পুঁতিল।

দুই

মাস ছয় কাটিয়াছে। গাছগুলি বড় হইয়াছে। কিন্তু কলা একটিও হয় নাই। মোচার মতো হয়, কিন্তু তাহা হইতে কলার কাঁদি বাহির হয় না, ফুল হইয়া যায়। কোনোটা লাল ফুল, কোনোটা হলদে। হারাধন আবার ভাল করিয়া গোবর দিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। ক্রমাগত ফুল হইতে লাগিল, কলা কই?

চটিয়া-মটিয়া আবার একদিন সে কলিকাতার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। এবার আর তাহার রাস্তা ভুল হইল না। সোজা সে সেই তরকারির বাজারে হাজির হইল আবার। সন্দেহ ছিল শ্যামচাঁদের দেখা পাইবে কি-না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে শ্যামচাঁদ ছিল। অন্য ফুলের চারা বেচিতেছিল সে।

"এই যে! আচ্ছা, সেবার তুমি যে আমাকে পাঁচ টাকায় পাঁচটা বিলিতি কলার গাছ বেচলে, কিন্তু এক কাঁদি কলাও তো নামল না।"

শ্যামচাঁদ খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকাইয়া রহিল, তাহার পর মনে পড়িল তাহার।

"কিছুই হয়নি?"

"খালি ফুল হচ্ছে। নানা রঙের ফুল।"

"তাই তো হবে। বিলিতি কলা যে!"

"কি রকম?"

"ওতে খাবার কলা হয় না। দেখবার কলা হয়।"

"কিন্তু দিব্যি করে বলছি একটি কলাও দেখিনি।"

"কিন্তু এখনি নিজের মুখে বললে ফুল হচ্ছে।"

"তা হচ্ছে তো—"

"ওই ফুলই কলা। সাহেবরা বলে আর্ট, বাংলায় ওকেও কলা বলে।"

"কি রকম ?"

"ওই রকম। যাও, মেলা বক্ বক্ করে আমার সময় নষ্ট কোরো না! বিলিতি কলাগাছে মর্তমান কলা ফলবে কি করে! কি আপদ।"

হারাধন খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বহুকাল পরে সাহেব-বাড়ির এক মালী তাহাকে আর একটু জ্ঞানদান করিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ওর বিলিতি নাম ক্যানা!"

তিন

বিখ্যাত পুষ্পবিক্রেতা নগেন্দ্রনাথ এণ্ড কোং-এর নাম আপনারা নিশ্চয় শুনিয়াছেন। ক্যানা ফুল বিক্রয় করিয়াই তিনি মাসে হাজার টাকা রোজগার করেন। তাঁহার ক্যানা না কি ভারতবর্ষের বাহিরেও যায়। হারাধন ছিলেন নগেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ। নগেন্দ্রনাথ আর একটি জিনিসও করিয়াছেন। এক রকম এসেন্স বাহির করিয়াছেন যাহার গন্ধ ঠিক কলার মতো। জিনিসটা ঘোলের শরবতে খুব চলে।

চার

নগেন্দ্রনাথের পুত্র স্বরজিৎ নূতন পথ ধরিয়াছে। সে একজন অতি-আধুনিক কবি। বাজারে বেশ নাম হইয়াছে।

পুত্র

নূতন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মফস্বলে টুর করতে বেরিয়েছেন। এই প্রথম বেরিয়েছেন তিনি। প্রতিভাবান বাঙালী যুবক, অল্প কিছুদিন আগেই বিলেত থেকে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সসম্মানে। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে স্টেশনে এসেছেন প্রবীণ অবাঙালী সাব-ডিভিশনাল অফিসার, সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ (ইনি খাঁটি সাহেব) থানার দারোগা, কয়েকজন কনস্টেবল। আর এসেছেন জিতেন্দ্রনাথ বসু, সাব ডিভিশনাল অফিসের কেরানী একজন। স্টেশনের বাইরে তিনখানি মোটর কার দাঁড়িয়ে আছে। একটি এস. ডি. ও. সাহেবের, একটি এস. পি.-র। তৃতীয় কারটি স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী যুগলরাম মারোয়াড়ীর। এই তৃতীয় কারটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কারণ এটি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত। সাধারণতঃ বিয়ের সময় বরের গাড়ি যেভাবে সাজানো হয় এটি সেইভাবে সাজানো। এ গাড়িটি চেয়ে এনেছেন কেরানী জিতেন্দ্রনাথ বসু।

……ট্রেন একটু লেট আসছে। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছেন সবাই। ছোট শহরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আগমনও একটা হৃৎস্পন্দনকর ঘটনা। স্টেশন মাস্টার, টিকিট কালেক্টার পর্যন্ত একটু যেন সন্ত্রস্ত ও বিচলিত। তখন ইংরেজের আমল, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরাই তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বৃটিশ শাসনের প্রতিভূ ও প্রতীক। লাল-পাগড়ি পুলিশ, দারোগা, এস. পি., এস. ডি. ও. এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যে প্ল্যাটফর্মে সমবেত যাত্রীরা পর্যন্ত সহজে নিশ্বাস নিতে পারছেন না। প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে আধময়লা জামা-কাপড়-পরা জিতেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন সসঙ্কোচে। তাঁর মনিব সাব-ডিভিশনাল

অফিসারের সামনে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করতে পারছেন না তিনি। কিন্তু তাঁর নাচতে ইচ্ছে করছে।

ঢং ঢং ঢং ঢং—ঘণ্টা পড়ল। ট্রেন আসছে।

দেখতে দেখতে এসে পড়ল ট্রেন। এস. ডি. ও., এস. পি. এগিয়ে গেলেন প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে। জিতেনবাবুও দৌড়ে গেলেন, কিন্তু খুব কাছাকাছি যেতে পারলেন না। মনিবের সঙ্গে সম্মানসূচক দূরত্ব রক্ষা করে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলেন।

গাড়ি থেকে নামলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। কচি মুখ, নেহাত ছেলেমানুষ। প্রতিভার দীপ্তি কিন্তু বিচ্ছুরিত হচ্ছে চোখ-মুখ থেকে।

নেমেই এস. ডি. ও. এবং এস. পি.-র সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড করলেন। এগিয়ে আসতে লাগলেন তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে করতে। কিছু দূর এসেই জিতেনবাবুকে পেলেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে। অবাক হয়ে গেল সবাই।

এস. ডি. ও.-র দিকে ফিরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, "ইনি আমার বাবা।" এস. ডি. ও. এই ধরনের একটা কানাঘুষো শুনেছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করেননি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথা শুনে নমস্কার করলেন জিতেনবাবুকে। কিন্তু নিজের অধীনস্থ কেরাণীর কাছে সর্বসমক্ষে মাথা নোয়াতে হল বলে ক্ষুব্ধও হলেন একটু।

খাঁটি সাহেব এস. পি. বাঙালী-মহলে-প্রচারিত এ খবরটা জানতেনই না। বেশ অবাক্ হলেন। কিন্তু টুপটা ঈষৎ তুলে শিষ্টাচারসম্মত অভিবাদন জানাতে কসুর করলেন না।

জিতেনবাবু বললেন, "আমি গাড়ি এনেছি—"

"ও—"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

"জাস্ট এ মিনিট সার—"

এস. পি. তাঁকে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গেলেন একপাশে। এস. ডি. ও. সাহেব সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

এস. পি. বললেন, "আপনি আমার ওখানে চলুন। এখানে ভালো ডাক বাংলো নেই। আমার বাংলোতেই সব ব্যবস্থা করেছি আপনার। ডিনার ইজ ওয়েটিং—" এস. ডি. ও. বললেন, "এক্সকিউজ মি, আর একটা কথাও বিবেচনা করবার আছে। মিস্টার বোস আমার আপিসের একজন ক্লার্ক। একজন সাব-অর্ডিনেট ক্লার্কের বাড়িতে আপনার ওঠাটা অফিসিয়াল দৃষ্টিতে একটু অশোভন হবে না কি? জানেনই তো আজকাল যিনি কমিশনার, অফিসিয়াল কর্মের দিকে তাঁর খুব কড়া নজর।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন। তারপর বাবাকে গিয়ে বললেন সে-কথা। জিতেনবাবু বললেন, "ও, তাই নাকি! তাহলে যাও তুমি ওদের সঙ্গেই। কমিশনার সাহেব সত্যিই খুব কড়া লোক। হয়তো—না থাক, ওদের সঙ্গেই যাও তুমি।"

এস. পি. সাহেবের গাড়িতে চড়ে চলে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।

তাঁর পিছু পিছু এস. ডি. ও. সাহেবও গেলেন।

পুষ্পে-পত্রে সজ্জিত যুগল মারোয়াড়ীর গাড়িটা দাঁড়িয়ে রইল।

জিতেনবাবু ড্রাইভারকে গিয়ে বললেন, "একটা জরুরি দরকারে ওকে পুলিশ সাহেবের সঙ্গে চলে যেতে হল। তোমার গাড়ির আর দরকার হল না। তুমি যাও—"

যুগলবাবুর গাড়ি চলে গেল।

জিতেনবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর হেঁটে হেঁটেই নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন তিনি।

অতিশয় ছোট বাড়ি তাঁর, গলির গলি তস্য গলির মধ্যে। তবু এই বাড়িটিকেই যথাসাধ্য সাজিয়েছিলেন তিনি। চুনকাম করিয়েছিলেন। বাড়ির সামনেটা দেবদারু পাতা আর রঙীন কাগজের শিকল দিয়ে অলঙ্কৃত করেছিলেন; একটা লাল শালুর উপর সাদা অক্ষরে 'স্বাগত' লিখেও টাঙিয়ে দিয়েছিলেন বারান্দার সামনে। দুচারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন এই

জিতেনবাবু যখন ফিরে এলেন তখনও তাঁর নিমন্ত্রিত বন্ধুরা বসে ছিলেন।

“সুকু আসতে পারলে না। একটা জরুরি দরকারে পুলিশ সাহেব টেনে নিয়ে গেল তাকে।”

“তাই না কি—”

হতাশ হলেন দু-একজন, কেউ কেউ অবাক্ হলেন, মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করলেন দু-একজন। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেলেন একে একে।

সবাই চলে যাবার পর জিতেনবাবু চুপ করে বসে রইলেন বারান্দার উপর খানিকক্ষণ। তিনি বিপত্নীক। ওই সুকুমারই তাঁর একমাত্র সন্তান। বড় আশা করেছিলেন সে এসে তাঁর কাছেই উঠবে। কিন্তু এল না।

দুই

গভীর রাত্রি, থমথম করছে চতুর্দিকে। জিতেনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন ;

“বাবা—বাবা—”

দুয়ারে কড়া সশব্দে নড়ে উঠল।

তড়াক করে উঠে বসলেন জিতেনবাবু।

এতরাত্রে কপাটে ধাক্কা দিচ্ছে কে! তাড়াতাড়ি গিয়ে কপাটটা খুলে দিলেন।

"এ কি, সুকু!"

"আমি এইখানেই চলে এলাম। কমিশনার সাহেব যা-ই মনে করুক, আমি তোমার কাছেই থাকব—"

জড়িয়ে ধরলেন তাকে জিতেনবাবু। কেঁদে ফেললেন।

"এত রাত্রে কি করে এলি তুই—"

"হেঁটেই চলে এলাম।"

রূপ-রূপান্তর

কোলকাতা থেকে মণিহারী যাচ্ছি। সাহেবগঞ্জে গাড়ি বদলাতে হবে। সাহেবগঞ্জে ঘাট-গাড়ি পাওয়া যায়, সেই গাড়িতে চড়ে যেতে হবে সকরিগলি ঘাট। সেখান থেকে স্টীমারে চড়ে যেতে হবে মণিহারী ঘাটে। মণিহারী ঘাট থেকে মণিহারী যাওয়ার গাড়ি পাওয়া যাবে।

সাহেবগঞ্জে নেমে দেখলাম ঘাট-গাড়ি তখনও প্ল্যাটফর্মে আসে নি। কুলি বললে, "গাড়ি 'সাইডিং'য়ে লাগানো আছে। সেখানে গিয়েই চড়া ভালো কারণ সবাই সেইখানে গিয়েই চড়ছে। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে আসার আগেই ভর্তি হয়ে যাবে।"

সে আমাকেও সাইডিংয়ে গিয়েই চড়বার পরামর্শ দিলে। গিয়ে দেখলাম থার্ড ক্লাস প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। একটিমাত্র ইণ্টার ক্লাস (তখন ইণ্টার ক্লাস উঠে যায়নি) আর তার ভিতরে দাড়িওলা ভীষণ-দর্শন লোক বসে আছেন একজন। দ্বিতীয় আর কোনও লোক নেই। কপাট খুলে ঢুকতে গেলাম, কপাট খোলে না।

বললাম, "কপাটটা খুলুন মশাই।"

"আমি তো কপাট লাগাইনি, আমি জানলা গলে ঢুকেছি, আপনিও পারেন তো ঢুকুন।"

মহামুশকিলে পড়ে গেলাম। প্ল্যাটফর্ম নেই, অত নীচু থেকে জানলা গলে ঢোকা অসম্ভব মনে হল আমার পক্ষে। কুলিটা বললে, "আপনি বাবু আপনার এই ট্রাঙ্ক আর বিছানার উপর দাঁড়িয়ে ওই হাতলটা ধরে ঝুলে পড়ুন। আমি পিছন থেকে আপনাকে ঠেলে দিচ্ছি ঠিক উঠে যাবেন—"

তাই করেই উঠলাম। কনুয়ের কাছটা একটু ছড়ে গেল। আমি

যখন ছিঁচড়ে জানলা গলে উঠছিলাম তখন ওই দাড়িওলা ভদ্রলোক এতটুকু সাহায্য করেননি, আমাকে যদি একটু ধরতেন কনুইটা হয়তো জখম হত না। একটি বেঞ্চে নিজের জায়গাটা দখল করে বসে তাঁর দিকে চাইলাম একবার। দেখলাম তাঁর চক্ষু দুটি অগ্নি বর্ষণ করছে। মনে হল এরকম পাজি লোক আর দেখিনি। সমস্ত কামরাটা একাই দখল করে থাকতে চায়।

একটু পরেই আর একদল যাত্রী এসে হানা দিলে আবার। আমাকে যে কুলিটা তুলে দিয়ে গেছে, দেখলাম সে-ই এসেছে আবার এদের মাল-পত্র নিয়ে। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁর সঙ্গে একটি অবগুণ্ঠনবতী, নারী, সঙ্গে গুটি তিনেক ছোট ছেলে। একটি ছ-সাত বছরের, একটি বছর চারেকের, আর ছোটটি বছর দুয়েকের বেশি হবে না। এদের পক্ষে জানলা গলে ঢোকা একেবারে অসম্ভব।

কুলিটা আমার দিকে চেয়ে বললে, "আপনি বাবু ছেলে দুটোকে তুলে নিন। তারপর আমি ভিতরে ঢুকে এদের টেনে তুলছি।"

দাড়িওলা ভদ্রলোক এতক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে দেখছিলেন এদের দিকে। হঠাৎ স্বগতোক্তি করলেন—"যত ভাবি একা থাকব ততই জড়িয়ে পড়ি। পাপ পাপ, পূর্বজন্মের পাপ সব!"

উঠে এলেন এবং দরজার ফাঁকে যে ছোট ইটের টুকরোটি গুঁজে রেখেছিলেন সেটি খুলে নিজের পকেটে রেখে দিলেন। কপাট খুলে গেল। সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলাটি আর ছেলেগুলি উঠে পড়ল গাড়িতে।

ভদ্রলোক এদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করলেন তা আমার আর দেখবার অবসর হল না। কারণ সঙ্গে সঙ্গে আমার এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

"মণিহারী যাচ্ছিস বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার গাড়িতে আয়। তোর সঙ্গে কথা আছে একটু। কেস যোগাড় করেছি তোর জন্যে দুটো।"

আমি ইন্‌সিওরেন্সে দালালি করি তখন। কেসের কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

"জায়গা আছে তো গাড়িতে?"

"আছে।"

সেই কুলিটাকে দিয়েই জিনিসপত্র বইয়ে আবার অন্য একটা কামরায় হাজির হলাম গিয়ে।

সকরিগলি ঘাটে গিয়ে আর দাড়িওলা ভদ্রলোকের খোঁজ পাই নি। প্যাসেঞ্জারের ভিড়ে কে যে কোথায় চলে গেছে ঠিক নেই।

স্টীমারে উঠে তাঁকে দেখতে পেলাম। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দেখলাম তিনি গঙ্গার স্নান করছেন, আর ওই তিনটি ছেলেকে স্নান করাচ্ছেন। সকরিগলিতে স্টীমার খানিকক্ষণ থামে, স্নান করে নেওয়ার সময় পাওয়া যায়। দেখলাম দাড়িওলা ভদ্রলোক খুব স্নেহভরে স্নান করাচ্ছেন ছেলেগুলিকে। গামছা দিয়ে ঘষে ঘষে গায়ের ময়লা তুলছেন, মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন, চোখের কোণ পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। ছেলেগুলো আপত্তি করছে, কিন্তু তিনি শুনবেন না। দেখে বেশ অবাক লাগল। এই লোকই কিছুক্ষণ আগে ওদের ট্রেনে উঠতে দিচ্ছিল না।

........স্টীমারে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হল। জিজ্ঞাসা করলাম—"ওই ভদ্রলোক কি আপনার কোনো আত্মীয় হন?

"না। এই একটু আগেই ওঁর সঙ্গে আলাপ হল ঘাট-ট্রেনে। উনি হিন্দু আমি মুসলমান। এ কথা অবশ্য বলি নি ওঁকে। ভদ্রলোকের মাথায় একটু ছিট আছে—"

এই বলে মুচকি হাসলেন।

"ও।"

আর কিছু বললাম না।

ওপারে গিয়ে মণিহারীর ট্রেনে চড়বার সময় দেখলাম দাড়িওলা ভদ্রলোক সেই ছোট ছেলেটিকে দুহাতে বুকের কাছে তুলে আদর করছেন আর সে মুঠো করে তাঁর দাড়ি চেপে ধরেছে।

"আরে যোগেনবাবু যে, কোথা চলেছেন—"

"দিনাজপুর যাব।"

দেখলাম মণিহারী ঘাটের একজন টিকিট কালেক্টারের সঙ্গে দাড়িওলা ভদ্রলোকের কথা হচ্ছে। টিকিট কালেকটারটি আমারও চেনা। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, "বাড়ি যাচ্ছেন না কি?"

"হ্যাঁ।"

আমি একটি কামরায় গিয়ে উঠে বসলাম। একটু পরে সেই টিকিট কালেক্টার ভদ্রলোকও এলেন আমার কামরায়। একথা-সেকথার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,—"আপনি ওই দাড়িওলা ভদ্রলোককে চেনেন না কি?"

"হাঁ, খুব চিনি। পূর্ববঙ্গে আমাদেরই গ্রামে বাড়ি ওর। খুব মানী পরিবারের ছেলে—"

তারপর একটু থেমে বললেন, "গত রায়টে ওর সর্বনাশ হয়ে গেছে!"

"কি রকম?"

"ঘর-বাড়ি তো সব গেছেই, পুড়িয়ে দিয়েছে সব। ওঁর স্ত্রী ছেলে-মেয়েগুলোকে পর্যন্ত মেরে ফেলেছে। কেউ নেই—"

নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম।

নবজীবন-স্রোত

শ্রীযুক্ত রামবৃছ সিং শ্রীযুক্ত কমলকুমার মিত্রের প্রতিবেশী, পাশাপাশি বাড়িতে বাস করেন। পরিচয় বেশি দিনের নয়, কারণ উভয়েই অল্প কিছুদিন পূর্বে চাকরি ব্যপদেশে এই শহরে আসিয়াছেন এবং দৈবাৎ পাশাপাশি দুইটি বাড়িতে ভাড়াটে রূপে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন উভয়ে উভয়ের পরিচয় লওয়াও প্রয়োজন মনে করেন নাই। সুযোগও ছিল না। দুইজন দুই বিভিন্ন আপিসে চাকরি করেন। একজন পোস্ট-আপিসে, একজন রেলে। নিজের নিজের আপিস আর সংসার লইয়াই দুইজনকে ব্যস্ত থাকিতে হয়, প্রতিবেশীর সংবাদ লইবার মতো অবসর মেলে না। ছুটির দিনও না। ছেলেদের মধ্যে কিন্তু এতটা ঔদাসীন্য দেখা গেল না। কমলকুমারের দশ বছরের ছেলে অমলকুমার রামবৃছের বারো বছরের ছেলে ছবিলালের সহিত আলাপ করিয়া ফেলিল। তাহাদের আলাপ করিবার সুযোগও ছিল। একই স্কুলে একই ক্লাসে ভর্তি হইয়াছিল তাহারা।

অমলকুমার একদিন তাহার মাকে বলিল, "মা, জান ছবিলাল আমাদের সঙ্গে পড়ে, সে সেভন্ বলতে পারে না, বলে—সেভুন।"

কমলকুমার আয়নার সম্মুখ নানা মুখভঙ্গী করিয়া দাড়ি কামাইতেছিলেন, তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ছবিলাল কে?"

"পাশের বাড়িতে থাকে। ওর বাবার নামটাও অদ্ভুত রামবৃছ"—

অমল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কমলকুমার বলিলেন, "ও বুঝেছি। রামবৃছ সিং আমাদের পাশের বাড়িতে আছে না কি?"

"হ্যাঁ।"

গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া কমলকুমার বলিলেন, "ওর জায়গায় আমাদের বিশ্বেশ্বরবাবুর আসবার কথা ছিল। তিনি ওর চেয়ে সিনিয়র লোক, কিন্তু তিনি তো বিহারী নন, কোনো মিনিস্টারের সঙ্গে তাঁর কোনো আত্মীয়তাও নেই—"

কমলকুমার বাঁকা হাসি হাসিয়া গাল চাঁছিতে লাগিলেন।

একটি নাতি-সুচরিত্রা ঠিকা দাই বারন্দা ঝাড়ু দিতেছিল। সে বাংলা বোঝে, রামবৃছবাবুর বাড়িতেও কাজ করে। সে যথাসময়ে উক্ত কথোপকথনটি রামবৃছবাবুর পরিবারে নিবেদন করিল। রামবৃছবাবু সংবাদটি শুনিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার চিত্ত অমৃত-নিষিক্ত হইল না। তিনি গোঁফে চাড়া দিয়া একটি উদ্গার তুলিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, শালা বাঙালিয়া— !

কমলকুমারের বাড়িতে সরবরাহ করিবার মতো একটি সংবাদও একদিন উক্ত ঠিকা দাই সংগ্রহ করিয়া আনিল।

কমলকুমারের গৃহিণী সহসা একদিন সকালে হাতে আকাশের চাঁদ পাইয়াছিলেন। একজন ফেরিওয়ালা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া কিছু চিংড়িমাছ এবং নোনা ইলিশ তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছিল। তিনি মহা-সমারোহে সেগুলি রন্ধন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রন্ধন-কালে সম্ভবতঃ রান্নাঘরের জানালাটি খোলা ছিল, চিংড়িমাছ এবং নোনা ইলিশের গন্ধ বায়ু-বাহিত হইয়া রামবৃছ সিংয়ের অন্তঃপুরকে আমোদিত করিয়া তুলিল। রামবৃছ তখন রহরকা দাল ও নিকমি সহযোগে মোটা আটার রোটি চর্বণে ব্যাপৃত ছিলেন। গন্ধ পাইয়া তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইল।

দাইকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ঘর মে কোই জানবার মরল বা?"

দাই মুচকি হাসিয়া আড় ঘোমটা টানিয়া নিবেদন করিল যে, না,

কোন টেবিল-চেয়ারও অনেক আনা হইল। ফুলের মালাও অনেক করিলেন। সন্ধ্যার সময় শহরের অনেক বাঙালী যুবক আসিয়া [illegible]ত হইলেন। কৌতূহলী রামবৃছ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, [illegible]চি! [illegible] কেন?”

মানু[illegible] উত্তর দিল, “বাংলা ভাষায় বিখ্যাত সাহিত্যিক ‘নবজীবন’-এর [illegible]শুনেছেন?

[illegible]মুচকি [illegible]‘খুব।”

আ[illegible]র আজ জন্মদিন। তাঁকে আমরা সংবর্ধনা জানাব বলে উচ্চ [illegible]ঙ্গের [illegible]য়াজন করেছি।”

[illegible]মাছের [illegible]বজীবন কি এখানে এসেছেন?”

“আরে তিনি তো আপনার বাড়ির পাশেই থাকেন। তাঁর আসল বাড়ি[illegible]কমলকুমার ঘোষ। এখানকার এ. এস. এম.।”

এক[illegible]বৃছের আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না, মুখটা একটু ফাঁক হইয়া [illegible]

প্রমোশন [illegible]ল।

কোনও ইং[illegible] [illegible]সহ বাহির করিয়া দিয়াছেন। রামবৃছ [illegible] হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা হইল, কে. কে. কমলকুমার ছাড়া আর কেহ নন। তিনি নিজের ইয়ারমহলে বাঙালীদের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শ্রাদ্ধের আয়োজন কমলকুমারও করিলেন। তাঁহার পুত্র অমলকুমার অতিশয় কম নম্বর পাইয়া কোনো ক্রমে ক্লাস-প্রমোশন পাইয়াছিল এবং বাড়িতে আসিয়া বলিয়াছিল যে, শিক্ষকেরা সব হিন্দী ভাষায় পড়ান, সে কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহা ছাড়া তাহারা পার্শিয়ালিটি করিয়া বেহারী ছেলেদের বেশি নম্বর দেন। কমলকুমার ইহা শুনিয়া যে সব ভাষা ব্যবহার করিলেন তাহা রীতিমত সাহিত্যিক ভাষা। গানই বাঁধিয়া ফেলিলেন একটা ‘বঙ্গ আমার জননী আমার’ গানের প্যারডি।

"হ্যাঁ।"

গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া কমলকুমার বলিলেন, "ওর জায় আমাদের বিশ্বেশ্বরবাবুর আসবার কথা ছিল। তিনি ওর ে সিনিয়র লোক, কিন্তু তিনি তো বিহারী নন, কোনো মিনিস্টা সঙ্গে তাঁর কোনো আত্মীয়তাও নেই—"

কমলকুমার বাঁকা হাসি হাসিয়া গাল চাঁছিতে লাগিলেন।

একটি নাতি-সুচরিত্রা ঠিকা দাই বারান্দা ঝাড়ু দিতেছিল। বাংলা মেয়ে, রামবৃছবাবুর বাড়িতেও কাজ করে। সে যথা উক্ত কথোপকথনটি রামবৃছবাবুর পরিবারে নিবেদন ক রামবৃছবাবু সংবাদটি শুনিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার চিত্ত ছ [illegible] হইল না। তিনি গোঁফে চাড়া দিয়া একটি উদ্গার তুলিে এবং মনে মনে বলিলেন, শালা বাঙালিয়া— !

কমলকুমারের বাড়িতে সরবরাহ করিবার মতো একটি সং একদিন উক্ত ঠিকা দাই সংগ্রহ করিয়া আনিল। আটকাইয়া

কমলকুমারের গৃহিণী সহসা একদিন সকালে হাতে জলনিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

রামবৃছ দন্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন, "মছলিখোর!"

দোলের দিনে রামবৃছের পরিবারবর্গ কাদায়-রঙে বিস্তুতকিমাকার হইয়া অশ্রাব্য ভাষায় 'হোলি' গাহিতে লাগিল।

কমলকুমার কানে আঙুল দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ব্যাটা বেহারী ভূত!"

এইভাবেই কিছুদিন চলিল। হয়তো বরাবরই চলিত; কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সব ওলটপালট হইয়া গেল।

রামবৃছ সিং একদিন লক্ষ্য করিলেন যে, কমলকুমারের বাড়ির সম্মুখস্থ ময়দানে একটি সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। সামিয়ানার

নীচে টেবিল-চেয়ারও অনেক আনা হইল। ফুলের মালাও অনেক আসিল। সন্ধ্যার সময় শহরের অনেক বাঙালী যুবক আসিয়া সমবেত হইলেন। কৌতূহলী রামবৃছ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ সব কেন ?”

সে উত্তর দিল, “বাংলা ভাষায় বিখ্যাত সাহিত্যিক ‘নবজীবন’-এর নাম শুনেছেন ?

“খুব।”

“তাঁর আজ জন্মদিন। তাঁকে আমরা সংবর্ধনা জানাব বলে এই আয়োজন করেছি।”

“নবজীবন কি এখানে এসেছেন ?”

“আরে তিনি তো আপনার বাড়ির পাশেই থাকেন। তাঁর আসল নাম কমলকুমার ঘোষ। এখানকার এ. এস. এম.।”

রামবৃছের আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না, মুখটা একটু ফাঁক হইয়া গেল কেবল।

সংবর্ধনা-সভা শেষ হইয়া গিয়াছে। শেষ যুবকটির সহিত কথাবার্তা কহিয়া কমলকুমার যখন বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, তখন রামবৃছ আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “শুনিয়ে—”

কমলকুমার ঘাড় ফিরাইতেই রামবৃছ করজোড়ে বলিলেন, “পহলেই ম্যয় মাফি মাংতা হুঁ। মুঝে মালুম নহি থা যে আপহি ‘নবজীবন’ হ্যায়। ম্যয় আপকা ভকত হুঁ।”

কমলকুমারও হাতজোড় করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রামবৃছ বলিলেন যে তিনি যদিও বাংলা বলিতে পারেন না, কিন্তু বাংলা বুঝিতে পারেন। ‘নবজীবন’-লিখিত অনেক গল্প তিনি অনুবাদ করিয়া প্রকাশও করিয়াছেন।

কমলকুমার বলিলেন, "তাই নাকি ? 'স্রোত' নাম দিয়ে আর একজন লেখকও আমার গল্পের চমৎকার অনুবাদ করেছেন দেখেছি।"

রামবৃছ হাতজোড় করিয়া স্মিতমুখে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ম্যয় স্রোত হুঁ।"

উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন।

স্মৃতির খেলা

সব শক্তির মতই স্মৃতি-শক্তি ব্যাপারটাও একটু গোলমেলে। কখন যে কি খেলা খেলেন বলা শক্ত। কখনও কৃপা করেন, কখনও করেন না। সেদিন আমার ভাগ্যে দুরকমই হ'ল এবং দুবারই নাকাল হতে হল আমাকে।

ফার্স্ট ক্লাসে বার্থ রিজার্ভ করে যাচ্ছি। গাড়িতে উঠে দেখলাম আর কোনোও যাত্রী নেই। নটা বেজে গেছে, সুতরাং গাড়িটি ভিতর থেকে 'লক্' করে শুয়ে পড়ার কোনো বাধা ছিল না। প্যাণ্টটি খুলে হুকে ঝুলিয়ে দিলাম, তারপর লুঙ্গিটি পরে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু 'লক' করতে ভুলে গেলাম। ফল যা হ'ল তা মর্মান্তিক। গভীর রাত্রে দড়াম্ করে একটা শব্দ হ'ল, ধড়মড় করে উঠে বসলাম। আলো জ্বেলে দেখি সামনের বেঞ্চে আড়ময়লা কামিজ-পরা এক ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে বসে রয়েছেন, আর গাড়ির মেঝেতে একটা হাঁড়ি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে। তার থেকে কালো চটচটে একটা পদার্থ কামরার চারদিকে ছড়িয়ে ছিটকে পড়েছে।

"কে আপনি মশাই, একি কাণ্ড!"

হাত কচলাতে কচলাতে ভদ্রলোক বললেন, "আলকাতরার হাঁড়িটা ওই টেবিলটার উপর রেখেছিলাম, কিন্তু ট্রেনটা এমন ঘচাং করে থামল যে, হাঁড়িটা পড়ে গেল—"

আলকাতরা! ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম আমার ঝোলানো প্যান্টের পা দুটোতে লেগেছে, বেঞ্চির নীচে স্যুটকেসটা ছিল তাতে লেগেছে আর জুতো-জোড়া তো মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। আপাদমস্তক রাগে জ্বলে উঠল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গার্ডকে ডাকলাম। দেখলাম ট্রেন একটা বড় স্টেশনেই দাঁড়িয়েছে।

গার্ডসাহেব এসে সব দেখে শুনে বললেন, "আচ্ছা, আমি একটা মেথর পাঠিয়ে দিচ্ছি, যতটা পারে পরিষ্কার করে দিক—"

গার্ডসাহেব চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কালেকটার এলেন। দেখা গেল ভদ্রলোকের টিকিট থার্ড ক্লাসের।

টিকিট কালেকটার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—"কোথা যাবেন আপনি ?"

"এখানেই নামবো।"

টিকিট কালেকটার তখন পকেট থেকে ছোট বই বার করলেন একটি। বইটি দেখে বললেন, "আপনাকে দশটাকা সাড়ে পনর আনা এক্সেস্ ফেয়ার দিতে হবে।"

"আমার কাছে তো একটিও পয়সা নেই। আমি অন্ধকারে বুঝতে পারিনি এটা কোন্ ক্লাস। আমাদের স্টেশনে ট্রেনও এক মিনিটের বেশি দাঁড়ায় না। সামনে যে গাড়ি পেয়েছি তাতেই উঠে পড়েছি।"

টিকিট কালেকটার বললেন, "ওসব কথা জেনে আমার লাভ নেই। এক্সেস্ ফেয়ার আপনাকে দিতেই হবে। আপনি শুধু যে বিনা টিকিটে এসেছেন তা নয় রাতদুপুরে একজন ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারকে বিব্রত করে তাঁর গুরুতর ক্ষতি করেছেন। আসুন আমার সঙ্গে।"

টিকিট কালেকটরের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক চলে গেলেন। দেখা গেল, আলকাতরার হাড়িটি ছাড়া তাঁর আর কিছু ছিল না।

তারপর মেথর এল জল আর ঝাড়ু নিয়ে।

সে সব দেখে শুনে একটি সদুপদেশ দিলে আমাকে।

"পাশের কামরাটাও একদম খালি আছে বাবু। আপনি সেখানেই চলে যান। এ আলকাতরা সাফ করা এখন মুশকিল। কেরোসিন তেল না হলে উঠবে না। আমি আপনার জিনিসপত্রগুলো একটু মুছে টুছে দিচ্ছি।"

"ট্রেন কতক্ষণ থামবে এখানে ?"

"বহুক্ষণ থামবে হুজুর। অনেক মাল আছে, তাছাড়া আর একটা ট্রেনের সঙ্গে ক্রসিং হবে এখানে। আধঘণ্টা দাঁড়াবে এখানে। ইনজিনও বদলি হবে।"

মেথরটাই একটা কুলি ডেকে এনে পাশের কামরায় সব ব্যবস্থা করে দিলে আমার। বকশিস দিলাম তাকে।

পাশের কামরায় যখন গুছিয়ে গিয়ে বসলাম তখন আমার স্মরণ-শক্তি দ্বিতীয় খেলাটি খেললেন।

অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

তখন আমি কলেজে পড়ি। ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি। হাওড়া স্টেশনে থার্ডক্লাস কামরায় বসে আছি। যদিও সেদিন ভিড় খুব, তবু ভাল জায়গাই পেয়েছিলাম ভাগ্যক্রমে। জানালার ধারে বসেছিলাম মুখ বাড়িয়ে।

"কিরে, ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছিস নাকি—"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম প্রশ্নকর্তা সাহেবি-পোশাক-পরা, মুখে-পাইপ একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলাম। বাবার বন্ধু একজন। রেলের বড় অফিসার। প্রশ্ন করে আমার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি।

"থার্ডক্লাসের টিকিট বুঝি তোর। খুব ভিড় আজকে। ওহে রায়, শোন—"

একটি টিকিট কালেকটার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

"এই ট্রেনে তুমিই কি সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত যাচ্ছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

তারপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, "এ আমার বাল্যবন্ধুর ছেলে। ভিড়ে কষ্ট পাচ্ছে, ওকে ফার্স্টক্লাসে বসিয়ে নিয়ে যাও।"

"যে আজ্ঞে। আসুন আপনি।"

আমি থার্ডক্লাস থেকে নেমে পিতৃবন্ধুকে প্রণাম করলাম, তারপর রায়মশায়ের অনুসরণ করে একটি ফার্স্টক্লাসে গিয়ে চড়লাম।

একেবারে ফাঁকা গাড়ি।

বাবার বন্ধু আবার এলেন আমার কাছে।

"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে যা। রায় তোকে সাহেবগঞ্জে উঠিয়ে দেবে।"

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে আছি। ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে, প্রথম ঘণ্টা হয়ে গেছে, এমন সময় ছুটতে ছুটতে কানুদা এসে হাজির। হাতে একটা হাঁড়ি।

"ও তুই যাচ্ছিস এই ট্রেনে, যাক বাঁচলাম। এই গুড়ের নাগরীটা মামাকে দিয়ে দিস তুই। খেতু আজ যাবে বলেছিল তার হাতে দিয়েই এটা পাঠাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে দেখছি আসে নি। এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আজকালকার ছোকরারা!"

কানুদা কামরায় উঠে গুড়ের নাগরীটি বেঞ্চির নীচে ঢুকিয়ে রেখে দিলেন।

"কোণের দিকে ঠেসিয়া রেখে দিলাম, খুব সাবধানে নিয়ে যাস—"

গার্ডের হুইস্‌ল বাজল, কানুদা লাফিয়ে নেমে গেলেন। আমি শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে এবং খানিকক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল রাত্রে এক মেমসাহেবের চিৎকারে। উঠে দেখি একটি স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমার কামরার সামনে ভিড় জমে গেছে একটা। জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? শুনলাম মেমসাহেব নাকি আমার কামরায় ঢোকবার জন্য দরজা খুলে একটি পা ঢুকিয়েছিলেন: কিন্তু সে পা-টি আর তুলতে পারেন নি। তাঁর জুতো কামরার মেঝেতে একেবারে সেঁটে গিয়েছিল। তিনি পা-টি কোন রকমে বার করে নিয়েছেন, কিন্তু জুতোটি উদ্ধার

করতে পারেননি। তাঁর চিৎকারে চেঁচামেচিতে স্টেশন মাস্টার, গার্ড, টিকিট কালেকটার সবাই এসে জুটে গেছেন। গাড়ির আলো জ্বেলে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কানুদার সেই গুড়ের নাগরী কামরাময় গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়িয়েছে আর সমস্ত মেঝেটা চট্‌চটে গুড়ে ভরতি হয়ে গেছে।

স্টেশন মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, "এ নাগরী কি আপনার ?"

"না, আমি কিছু জানি না।"

স্টেশন মাস্টার তখন নিজেই হেঁট হয়ে মেমসাহেবের জুতোটিকে গুড়ের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। তারপর গদগদ বিনীত কণ্ঠে মেমসাহেবকে বললেন, "আই অ্যাম রিয়েলি সরি, ম্যাডাম। এ গাড়িতে আপনার বসা চলবে না, পিছনের দিকে আর একটা ফার্স্টক্লাস কামরা আছে, সেইখানে চলুন।"

সাহেব মেমসাহেবকে নিয়ে স্টেশন মাস্টার, গার্ড সবাই চলে গেলেন।

তখন সেই টিকিট কালেকটারটি আমার কাছে দাঁড়ালেন এসে। তাঁকে আমি নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি কি নেমে যাব ?"

"না, না, নামবেন কেন, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন। ওরাই কি টিকিট কিনে যাচ্ছে নাকি। ওরা প্ল্যান্টার সায়েব, প্রায়ই যাতায়াত করে। এক নাগরী গুড় নষ্ট হ'ল, এইটেই যা দুঃখের। আপনার সঙ্গে যে গুড় ছিল তা জানতাম না—"

বললাম তাঁকে সব কথা।

"ও। তাই বুঝি। আচ্ছা আমি মেথর ডেকে গাড়িটাকে ধুইয়ে দিচ্ছি। তা না হ'লে আপনার অসুবিধে হবে—"

মেথর এসে কামরাটি পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। আমি নির্বিঘ্নে যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম।

উক্ত গল্পটি মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হ'তে লাগল

সেই সহৃদয় টিকিট কালেকটারটি না থাকলে এ ভদ্রলোকের আজ যে দুর্দশা হয়েছে, আমারও সেই দশা হত। না হয় ভদ্রলোক ভুল করে, ফার্স্ট ক্লাসে চড়েই পড়েছেন, তা ব'লে হাজতে যেতে হবে তাঁকে! তাঁর অসহায় মুখচ্ছবিটা চোখের উপর ভাসতে লাগল। খচ্ খচ্ করতে লাগল মনটা। পকেটে সদ্য-প্রাপ্ত ফি দু'শ টাকা ছিল। ভাবলাম আমিই না হয় দিয়ে দি ভদ্রলোকের ভাড়াটা। কতদিকে কতই তো বাজে খরচ হয়—আমার স্মৃতিশক্তি অতীতের সেই ঘটনাটিকে বেশ উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন আমার মানসপটে।

নেমে পড়লাম।

স্টেশন মাস্টারের কামরার কাছে এসে শুনতে পেলাম সেই টিকিট কালেকটার ভদ্রলোক তারস্বরে বলছেন, "মাপ করবেন মশাই, আমি ছাড়তে পারব না। চাকরি করি, চাকরির আইন মেনে আমাকে চলতেই হবে। হয় ভাড়া দিয়ে দিন, না হয় লক্-আপে থাকুন।"

"শুনুন—"

হাতছানি দিয়ে ডাকলাম আমি ভদ্রলোককে।

"কি বলছেন ?"

"ছেড়ে দিন ভদ্রলোককে।"

"মাপ করবেন, তা আমি পারব না।"

"আমি ওঁর ভাড়াটা দিচ্ছি।"

"আপনি দেবেন কেন, ওরকম লোককে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।"

এমন সময় স্টেশন মাস্টার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

"আবার কি হ'ল। ঝামেলা মিটিয়ে ফেল না বাপু তাড়াতাড়ি।"

"এই ভদ্রলোক ওঁর হয়ে ভাড়াটা দিয়ে দিতে চাইছেন।"

"কে ?"

আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়েই কিন্তু স্টেশন মাস্টারের মুখের চেহারা বদলে গেল। তাঁর স্মরণ-শক্তি কৃপা করলেন তাঁকে। উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এসে তিনি আমার পায়ের ধুলো নিলেন।

"ডাক্তারবাবু যে, আপনি কোথা থেকে—"

"একটা রোগী দেখে ফিরছি। এই লোকটিকে ছেড়ে দিন, এঁর ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি—"

"আরে, ভাড়া দিতে যাবেন কেন! আপনি ছেড়ে দিতে বলছেন, তাই যথেষ্ট—"

মাস্টারমশাই যখন আমাদের স্টেশনে ছিলেন তখন তাঁর ছেলের টাইফয়েডের চিকিৎসা করেছিলাম আমি।

"শনটু কেমন আছে আজকাল ?

"ইয়া মোটা হয়েছে। এখন দেখলে চিনতেই পারবেন না।"

জন বুল

জন বুল থাকতেন বিলেতে আর বিপিন মল্লিকের বাড়ি ছিল বাংলাদেশে। একজনের লণ্ডনে আর একজনের কোলকাতায়। তবু দু'জনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল এবং সূত্রটা ছিল পাটের। পাটের কারবারী ছিলেন দু'জনেই। বিপিন মল্লিক এখান থেকে পাট কিনে চালান দিতেন এবং জন বুল সেখানে সেটা বেচতেন। লাখ লাখ টাকার কারবার চলতো! দু'জনের কিন্তু সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না।

হঠাৎ একদিন জন বুলের খেয়াল হলো, বাংলাদেশটা বেড়িয়ে আসা যাক। তাঁর কাছে বাংলাদেশ মানে অবশ্য কোলকাতা শহর। চিঠি লিখলেন বিপিন মল্লিককে—মাই ডিয়ার মিস্টার মল্লিক, আমি....তারিখে কোলকাতা পৌঁছুচ্ছি....নামক স্টীমারে। একটা ভাল হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা কোরো এবং অসুবিধা না হয়তো স্টীমারঘাটে এসো। ব্যবসাটা আরও বাড়ানো সম্ভব কি-না সেটাও দেখবো। তোমাদের শহরটাও দেখবো। যা যা ব্যবস্থা করা দরকার তা কোরো। তুমি তো আমাকে চেনো না, আমাদের আপিসের মিস্টার স্টীফেনকে সঙ্গে করে এনো, তাহলে আর কোনও অসুবিধা হবে না মিস্টার স্টীফেনকেও আমি চিঠি লিখলাম। তোমার যদি কোনও অসুবিধা হয় তাহ'লে আসবার দরকার নেই। মিস্টার স্টীফেনের সহায়তায় আমিই তোমাকে খুঁজে বার করবো। আশা করি ভালো আছ। আমার শুভেচ্ছা নাও। ইতি—

ভবদীয়
জন বুল।

নির্দিষ্ট দিনে জন বুল এসে পড়লেন। বিপিন মল্লিক এবং মিস্টার স্টীফেন স্টীমারঘাটে ছিলেন। বিপিন মল্লিকের মনে মনে

যথেষ্ট ভয় ছিল—কি জানি কি রকম লোক হবে! খাঁটি বিলিতী সাহেব, তাছাড়া অত বড় লোক! বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঠনঠনের কালীতলায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে 'মাকে অনেক কাকুতি-মিনতি জানিয়ে এসেছিলেন তিনি। জন বুলের সঙ্গে আলাপ হয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। চমৎকার লোক! বেশ হাসি-খুশি, একটু দেমাক নেই, কথা বেশ স্পষ্ট, বুঝতে কষ্ট হয় না একটুও। এইটেই তো ভয় ছিল মল্লিক মশায়ের সবচেয়ে বেশি—বিলিতী সায়েব হাঁউ হাঁউ করে কি বলবে, বোঝাই যাবে না হয়তো! জন বুলের কথা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। সমস্ত বোঝা যাচ্ছে।

স্টীমার থেকে নেমে জন বুল ট্যাক্সিতে উঠলেন। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। অসংখ্য লোক, সবাই কর্মব্যস্ত, ঘর্মাক্ত-কলেবর।

—খুব পরিশ্রমী তো এখানকার লোক দেখছি, কতক্ষণ কাজ করে?

মল্লিক বললেন,—দিবারাত্রিই খেটে চলেছে।

—তাই নাকি? বাঃ!

মুগ্ধনয়নে দেখতে দেখতে চললেন জন বুল। মনে হতে লাগলো, খুব ভুল একটা ধারণা ছিল তাঁর। ট্যাক্সি ছুটে চলেছে।

জন বুল আবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন,—কি খায় এরা?

—ডাল ভাত তরকারি। তাও পেট ভরে পায় না সব সময়ে—আবার উত্তর দিলেন মল্লিক একটু হেসে।

—আই সি! ছোট্ট একটু শিস দিয়ে চুপ করে গেলেন জন বুল। তারপর স্টীফেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি একটা জিজ্ঞেস করলেন চুপি-চুপি।

—ও নো, মোটেই না। মাথা নেড়ে স্টীফেন বললেন। মল্লিক ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না ঠিক। চুপ করে রইলেন।

হোটেলে পৌঁছে জন বুল বললেন,—অনেক ধন্যবাদ মিস্টার মল্লিক। আমি এখন খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করবো একটু। তারপর যাবো আপিসে। আপিসের কাজকর্ম সেরে বেলা পাঁচটা নাগাদ বেড়াতে বেরুবো। মিস্টার স্টীফেনের আজ কোথায় যেন একটা পার্টি আছে। বিকেলে তিনি যেতে পারবেন না আমার সঙ্গে। আপনি আসতে পারবেন কি ?

—হ্যাঁ, খুব পারবো।

—অনেক ধন্যবাদ।

ঠিক পাঁচটার সময় একটা ট্যাক্সিতে চড়ে জন বুল এবং বিপিন মল্লিক শহর পরিদর্শন করতে বেরুলেন। মনুমেণ্ট, চৌরঙ্গী, লাটসাহেবের বাড়ি, মিউজিয়ম প্রভৃতি নানা জিনিস দেখতে দেখতে অবশেষে ধর্মতলায় এসে পৌঁছুলেন তাঁরা। জন বুল হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, কিছুদূর অন্তর অন্তর ওই যে আলো দিয়ে আয়না দিয়ে সাজানো ছোট ছোট দোকান রয়েছে—কি ওগুলো ? দোকানদার দেখছি কোথাও পুরুষ, কোথাও স্ত্রীলোক, কোথাও বালক।

মল্লিক বললেন, ওগুলো পানের দোকান।

—পান ! সে আবার কি ? মিষ্টান্ন কোনও রকম ? সবাই তো কিনে কিনে খাচ্ছে দেখছি।

—না, মিষ্টান্ন নয়, তবে খেতে চমৎকার। আপনি খাবেন ?

—বেশ তো।

একটা ভালো পানের দোকানের কাছে ট্যাক্সি থামিয়ে মল্লিক নেমে গেলেন।

—একটা ভালো পান দাও তো, বেশ মশলা-টশলা দিয়ে দিও, সাহেব খাবে।

বেশি দাম দিয়ে রূপোর তবক দেওয়া দু'খিলি পান জন বুলকে এনে দিলেন মল্লিক।

—দু'টোই খেয়ে ফেলবো ? একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন সাহেব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দু'টোই খেয়ে ফেলুন। সোৎসাহে বললেন বিপিন মল্লিক।

জন বুল দু'খিলি পানই মুখে পুরে চিবুতে লাগলেন। ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো আবার। একটু পরেই সাহেবের সাদা কস বেয়ে পানের ধারা গড়াতে লাগলো। সাহেব রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। মুছে রুমালের দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন তিনি।—এ কি, রক্ত না কি—মল্লিক, এ কি কাণ্ড!

—ও কিছু নয়, পানের পিক। আপনি চিবিয়ে যান।

জন বুল চিবুতে লাগলেন। কিন্তু একটু পরেই কি রকম যেন হতে লাগলো তাঁর। মাথাটা বনবন করে ঘুরছে, বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। সর্বনাশ, এ কি হলো!

—মল্লিক, আমি খুব অসুস্থ বোধ করছি। হোটেলে ফিরে চলো। ওয়াক্ ওয়াক্।

বমি করে ফেললেন জন বুল। দামী স্যুটে পানের ছোপ লেগে গেলো চারদিকে। কস বেয়ে পানের লাল রং ঝরছে—চোখ কপালে উঠেছে। ভয় পেয়ে গেলেন মল্লিক।

—হোটেলে চলো শীগ্গির।

হু হু করে ট্যাক্সিখানা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভীত মল্লিক জন বুলকে আস্তে আস্তে ধরে ধরে নামালেন ট্যাক্সি থেকে। তারপর কোনক্রমে লিফ্‌টের সাহায্যে নিয়ে গেলেন তাঁকে ঘরে।

দোতালায় সাহেবের জন্য আলাদা একটা ঘর ঠিক করাই ছিল। সাহেব ঘরে ঢুকে ধপাস করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। তারপর

বিহ্বল দৃষ্টিতে মল্লিকের দিকে চেয়ে বললেন,—একজন ডাক্তার ডাকো মল্লিক! আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না।

রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন মল্লিক মশাই। হলো কি! পানে দোক্তা-টোক্তা ছিল না কি? সত্যি যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে তো সর্বনাশ! পুলিশ-কেসে পড়তে হবে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন তিনি।

ডাক্তার নিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরলেন। এসে দেখেন, জন বুল মদ খাচ্ছেন। হুইস্কির বোতলের ছিপি খোলবারও তর সয়নি তাঁর। বোতলের মুখটা ঠুকে ভেঙেছেন। আধ বোতল শেষ করে ফেলেছেন।

মল্লিককে দেখে তাঁর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

—এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। আর কোনও ভয় নেই।

ডাক্তারবাবু তবু তাঁকে পরীক্ষা করলেন। তিনিও বললেন—না, আর কোনও ভয়ের কারণ নেই। ফী নিয়ে চলে গেলেন তিনি।

তিনি চলে যাবার পর জন বুল বললেন,—একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। আমি এসে থেকেই ভাবছিলাম।

—কি?

—ভাবছিলাম, তোমরা অত খাটো কিসের জোরে! স্টীফেন বললে আমাদের মতো যখন তখন মদ খাওয়া নিয়ম নয় তোমাদের। আমি ভাবছিলাম, কিসের জোরে খাটছো তাহলে। এখন দেখছি—ও বাবা—আমার মতো পাঁড় মাতালও যা খেয়ে ঘায়েল হয়ে পড়ে, তা অনবরত চিবুচ্ছ তোমরা! গড্!

জন বুল আর এক চুমুক নির্জলা হুইস্কি খেয়ে স্মিতমুখে মল্লিকের মুখের দিকে চাইলেন।

স্বাধীনতা

"স্বাধীনতা মানে কি ?"—পণ্ডিতমশায় জিজ্ঞাসা করলেন সুবলকে।

সুবল উত্তর দিলে—"নিজের অধীনতা।"

"নিজের অধীনতা বলতে কি বোঝ তুমি ?"

ঈষৎ মাথা চুলকে সুবল বললে—"মানে, নিজে আমি যা খুশি করব তারই অধিকার।"

"তোমার নিজের যদি খুশি হয় চুরি করব, ডাকাতি করব, মাস্টার ঠ্যাঙাব, পড়াশুনা করব না, সকলের অবাধ্য হব—তাহলে এইসব করবার অধিকার তোমাকে দেওয়ার নামই স্বাধীনতা ?"

"না স্যার !"

"তাহলে ?"

সুবল চুপ করে রইল। পণ্ডিতমশাই একে একে সব ছেলেকেই জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ সদুত্তর দিতে পারলে না। সুবলই ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে, সে-ই যখন পারলে না তখন আর কে পারবে ?

পণ্ডিতমশাই বললেন—"এখন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এখন আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে কথাটার মানে কি ! সুবল, তুমি ঠিকই বলেছ, কথায় কথায় মানে করলে স্বাধীনতা মানে নিজের অধীনতা বোঝায়। কিন্তু 'নিজের' কথাটার বিশেষ অর্থ আছে একটা। নিজের বলতে কি বোঝায় ? তোমাকে যদি দুটো আম দেওয়া হয়, একটা পচা আর একটা ভালো, আর যদি বলা হয় ওর মধ্যে একটা তুমি নিজের করে নাও, তাহলে কোন্‌টা তুমি নেবে ? ভালোটাই নেবে নিশ্চয়ই ! পশুরাও চায় যেটা ভালো সেটা নিজের হোক। মানুষ পশুর চেয়ে অনেক বড়, তাই সে শুধু নিজের চায় না,

নিজেদের ভালো চায়। সকলের ভালো হোক এইটাই সভ্য মানুষের কাম্য এবং সকলের ভালো করবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলে। যারা পরাধীন জাতি, তারা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা সাহস করে একটা ভালো কথা পর্যন্ত বলতে পারে না, যদি সেটা শাসক জাতির স্বার্থ-বিরোধী হয়। তাই স্বাধীনতা যাদের থাকে না, ভালো হবার অধিকারই তাদের থাকে না ; কারণ সকলের ভালো হোক—কোনও বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের এ অভিপ্রায় কখনই হতে পারে না। দেশের ভালো হোক, দশের ভালো হোক, সকলের ভালো হোক, এই-ই হলো স্বাধীনতার লক্ষ্য। যখন তোমরা আর একটু বড় হবে তখন বুঝতে পারবে আমাদের সকলের মধ্যেই ভগবান আছেন, 'স্ব' মানে ভগবান, তাই স্বাধীনতা মানে ভগবানের অধীনতা, যা মঙ্গলময় তারই অধীনতা।"

পণ্ডিতমশায়ের কথা মন দিয়ে সবাই শুনল, কিন্তু তাঁর কথার সমস্তটা বুঝতে পারল না সবাই।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেল। সুবল পণ্ডিতমশায়ের কথাগুলোই ভাবতে ভাবতে বাড়ি যাচ্ছিল। পণ্ডিতমশায় যা বললেন, তা যেন বড্ড বেশি ঘোরালো গোছের। ভগবান টগবান এনে এমন একটা ব্যাপার করলেন যে, ঠিক বোঝা গেল না সবটা। সে স্বাধীনতার একটা সোজা মানে খুঁজছিল মনে মনে।

একটু পরেই হঠাৎ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে! যা খুঁজছিল পেয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সুবলের মা বেড়াতে যাচ্ছিলেন একজনের বাড়িতে। দূরসম্পর্কের আত্মীয় হন তাঁরা, তাঁদের বাড়িতে কার যেন অসুখ করেছে। বেরোবার আগে মা সুবলকে বললেন—"ওরে, ভাঁড়ারঘরের তাকে দুটো আম আছে। যদি খিদে পায় তো তুই একটা নিস্ আর মনুকে একটা দিস্।"

মনুও তাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। মা-মরা ছেলে—তাদের আশ্রিত।

মা চলে গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খিদে পেয়ে গেল সুবলের। পড়ছিল, তড়াক করে উঠে ভাঁড়ার ঘরে চলে গেল সে। গিয়ে দেখলে দুটো আম রয়েছে বটে, কিন্তু একটা ভালো, আর একটা একটু পচা। পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে পড়ল। তিনি এই আমেরই উদাহরণ দিয়েছিলেন। যা ভালো সেটাকেই নিজের করে নেওয়া উচিত এবং সেইটে নেবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। পচা আমটা মনুকে দিতে কিছুতেই মন সরছিল না তার। ওকে দিলে ও নেবে; কারণ, ও আশ্রিত। কিন্তু সেটা দেওয়া কি উচিত?

পচা আমটাই নিলে সে, ভালোটা মনুকে দিলে।

একটা অদ্ভুত আনন্দে সমস্ত মনটা ভরে উঠল সুবলের। পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি সুবলদের বাড়ির কাছে। এক ছুটে সে চলে গেল পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি।

পণ্ডিতমশায় শোওয়ার আয়োজন করছিলেন।

"পণ্ডিতমশায়, স্বাধীনতার আর একটা মানে আমি খুঁজে পেয়েছি। যা করলে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায় তাই করবার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে।" সুবলের মুখ উদ্ভাসিত।

পণ্ডিতমশায় হেসে বললেন—"ঠিক বলেছ।"